খেরোর খাতা

লীলা মজুমদার

boiRboi.net

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৮৮ থেকে **চতুর্থ মুদ্রণ** পৌষ ১৩৯২ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৮৬০০
পঞ্চম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০৩ **মুদ্রণ সংখ্যা** ২২০০

ISBN 81-7066-939-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫·০০

banglainternet.com

বিষয়...

মেয়ে-চাকরে	...	১
ভূ-ভূত	...	৪
ইউরোপিয়ান্‌স্‌ ওন্‌লি	...	৭
ধাপ্পাবাজ ইত্যাদি	...	১০
শান্তিনিকেতন ১৯৩১	...	১৩
বোলপুরের রেল	...	১৭
ডাক্তার	...	২০
লেখকদের খোশ-গল্প	...	২২
ছেলে মানুষ কর	...	২৫
পটোদিদি	...	২৮
গিরীশদা	...	৩১
খাওয়া-দাওয়া	...	৩৪
নেশাখোর	...	৩৭
পাড়াপড়শী	...	৪০
চোর	...	৪৪
দজ্জাল মেয়ে	...	৪৭
মাছ-ধরা	...	৫০
কুকুর	...	৫৩
সাপ	...	৫৬
দুর্দিন ইত্যাদি	...	৫৯
ভালোবাসা	...	৬২
পূর্ণদার মাছ	...	৬৬
দাদামশাই ও স্বেন হেদিন	...	৬৯
ওষুধ	...	৭২
স্বামীরা	...	৭৬
কলকাতার রাস্তায়	...	৭৯
বাঘের গল্প	...	৮২
ইন্দ্রজাল	...	৮৫

boiRboi.net

বিষয়...

বিচিত্র গল্প	...	৮৮
জানোয়ার পোষা	...	৯১
সরল মানুষদের ঘোরপ্যাঁচ	...	৯৪
ঠকিয়ে খাওয়া	...	৯৭
গরীবের ঘোড়া-রোগ	...	১০০
জাঁ এর'বের	...	১০৩
বুটু ও পটোদিদি	...	১০৬
বাঘ ও বিজয়মেসো	...	১১০
রসের গল্প	...	১১৩
রেলগাড়িতে	...	১১৬
কালো সায়েব	...	১১৯
বেড়ালের কথা	...	১২৩
গিন্নিদের প্রসঙ্গে	...	১২৬
জ্যাঠাইমার অর্থনীতি	...	১৩০
বইপাড়া	...	১৩৩
দিলীপ	...	১৩৬
মালিকানা	...	১৩৯
কুসংস্কার	...	১৪২
মেয়েদের কথা	...	১৪৫

boiRboi.net

মেয়ে-চাকরে

চাকরেদের কথা বলি। বিশেষ করে মেয়ে-চাকরেদের। রোজ চার পাঁচটে ট্রাম-গাড়ির আধখানা বোঝাই করে যাওয়া-আসা করে। অনেক দূর থেকে একটা গুনগুন শব্দ শোনা যায়, যেমন কোনো পুরুষ-ভরা গাড়ি থেকে যায় না। বড্ড ভালো লাগে। পুরুষদের গানের গলা ভালো হতে পারে, কিন্তু ভিড়ের গলা !!—সে যাক গে। বছর কুড়ি আগে, আমিও সাত বছরের জন্য মেয়ে-চাকরে ছিলাম। তখন অবিশ্যি গুঞ্জন-মুখরিত মেয়ে-গাড়ি ছিল না, সাধারণ গাড়িতে গোটা চারেক মেয়েদের সীট থাকত। সেখান থেকে বড় জোর পুরুষকণ্ঠের খ্যাঁকখ্যাঁক শব্দ কানে আসত।

মেয়ে-চাকরেদের হালচাল রপ্ত হতে আমার পুরো সাতটা বছরই লেগেছিল। তারপরেই কাজে ইস্তফা দিয়েছিলাম ; কিন্তু সেই ইস্তক আমার মনে মেয়ে-চাকরেদের জন্য একটা নরম গরম জায়গা আছে। ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফিটফাট চেহারা, তাদের সঙ্গে বড় বড় ব্যাগ্ থাকে, তাতে ঘামের গন্ধ দূর করবার সুগন্ধী জিনিস থাকে। ওদের পাশে পুরুষদের দেখলে মনে হয় প্রজাপতির পাশে গুবরে-পোকা। সত্যি কথাই বলব, তাতে কেউ রাগ করলে কি আর করা ! ঢের বেশি যত্ন নিয়ে কাজ করত মেয়েরা, ওপর-ওয়ালারা খুব খুসি হতেন। পুরুষ সহকর্মীরা হিংসে করে বলত, 'মেয়েদের বুদ্ধি কম কিনা, না খাটলে ওদের চলবে কেন ! আমরা কেমন ম্যানেজ্ করে নিই দেখেননি ?'

তখন ম্যানেজ্ কথাটার নতুন মানে শিখলাম। ম্যানেজ্ মানে হল কাজ না করে ধরা না পড়া। ওদের সরল বিশ্বাস দেখে মায়া হত। যে-কোনো বিবাহিত মেয়েই সারা জীবন ধরে যে-সব জিনিস কাছে নেই, থাকবার নয়, তাদের বাদ দিয়ে কাজ চালিয়ে যায়। কোনো বাড়িতে এমন পুরুষ দেখলাম না যে তাদের ধরবার সাধ্যি রাখে। ডিম বাদ দিলে যা কখনোই হবার নয়, মেয়েরা হামেশাই ডিম বাদ দিয়ে তাই করে নেয়—এ-কথা পুরুষ ছাড়া সবাই মানে। আবার বলে কি না মেয়েদের বুদ্ধি কম। সত্যি কথা বলতে কি, এই যে পুরুষানুক্রমে মেয়েদের বুদ্ধিহীনতার প্রবাদ চলে আসছে, এতে মেয়েদের কম সুবিধে হচ্ছে না। তাছাড়া বেজায় বুদ্ধি না থাকলে মান্ধাতার আমল থেকে কেউ বোকা সেজে থাকতে পারত না। যাক গে, এখন চাকরে মেয়েদের কথাই হোক।

আপিসে দেখেছিলাম ভালো কাজ করত বলে মেয়েদের নাম হত, উন্নতি হত। তার ফলে তাদের আত্মসম্মান বাড়ত। বাড়ত মানে বেজায় বেড়ে যেত। সে এক ব্যাপার। চিরকাল যে জাত একা হাতে হেঁসেল ঠেলে এসেছে, আপিসে তারা নিজের হাতে পাখার সুইচ্ টিপত না, বন্ধ করত না ; কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেত না। টেবিলে রাখা একটা ঘণ্টি টিপত। বাইরে ছ্যাং-ছ্যাং করে ঘণ্টি বাজত, অমনি দেখতাম অনিমেষ বলে একজন রোগা ছোকরা ছুটে এসে পাখা চালানো, বন্ধ করা, জল গড়ানো সারত। অনিমেষ আমাদের ঘরের পিওন। ওসব হল পিওনদের কাজ, কর্মচারিণীদের নয়। সব বেয়ারাই কিন্তু পিওন নয়। ফরাশ বলে আরেক রকম বেয়ারা

ছিল। টেবিলের ওপর জলের গেলাস কিম্বা কালির শিশি উল্টে গেলে তাদের ডাকা হত। খুব তাড়াতাড়ি ডাকতে হত। অনেক সময় উঠে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে হত। নইলে জল-কালি চুঁইয়ে, টেবিলের টানায় ঢুকে, নামসই তারিখ ইত্যাদি মূল্যবান কীর্তি ধেবড়ে দিয়ে অভাবনীয় ক্ষতি করত। আমি অবিশ্যি সে-রকম হলে সেগুলো নিজেই আবার মন থেকে কি আন্দাজে লিখেটিখে রাখতাম।

একদিন একজনের টেবিল থেকে কাচের কাগজ-চাপা সরে যাওয়া খুব জরুরি কাগজপত্র পাখার হাওয়ায় ছোটখাটো একটা ঘূর্ণি তুলে, ঘরময় চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। বোঝা গেল যে-কোনো সময়ে তারা আকিয়াব যাত্রা করবে।

কর্মচারিণীরা ঘণ্টি বাজালেন, অনিমেষকে হাঁকডাক করলেন। দুঃখের বিষয় অনিমেষ অনুপস্থিত এবং জরুরি কাগজ সামলানো ফরাশের কাজ নয়, কাজেই তারা চুপ করে বসে রইল। শেষটা আর টিকতে না পেরে, আমিই উঠে কাগজগুলো কুড়িয়ে আবার চাপা দিয়ে রাখলাম।

কর্মচারিণীরা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন, 'ও কি করছেন দিদি, ও-তো পিওনের কাজ।' আমি বললাম, 'শুধু কি এই ? আমাদের বাড়ির গোছলখানার নালা বন্ধ হলে, অনেক সময় তা-ও সাফ করি!'

বলতে বলতে আরেকটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল। নিউমার্কেটের সামনে একটা ব্যাংক ছিল। সেখানে দেখি একজন মহিলা কর্মচারি। সে এক সময় আমাদের কলেজে পড়ত। মনে হল খুব দক্ষা কর্মচারি, ভালো মাইনে-টাইনে পায়। আমার চেয়ে অনেক

boiRboi.net

ভালো কাপড়চোপড় পরা। একদিন সে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তোমাদের রান্নার লোকের অসুখ করলে তুমি কি কর?'

আমি বললাম, 'অন্য চাকরদের দিয়ে রাঁধাবার চেষ্টা করি।'

কর্মচারিণী বলল, 'আর তারা যদি রাজি না হয়, বা না থাকে?'

'তাহলে নিজে রাঁধি. আবার কি করব? তুমি কি কর?' সে বলল, 'মায়ের বাড়িতে খেতে যাই। আমার স্বামী তাই নিয়ে অশান্তি করেন। ভারি ইয়ে' শেষটা বাঁদীর মতো হে'সেল ঠেলি আর কি!'

বাঁদী বলতে মনে হল একজন পুরুষ অফিসার টাকার লোভে বড়লোকের কালো মুখ্যু মেয়ে বিয়ে করেছিল। তারপর তাকে পছন্দ হয় না। আরেকটা বিয়ে করল। সেকালে তাতে কোনো দোষ হত না। এদিকে বড়লোক শ্বশুরটি তাঁর কালো মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, বিলেত পাঠিয়ে, লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে পাস্ করিয়ে এনে, ভালো চাকরি পাইয়ে দিলেন। দিনে দিনে তার উন্নতি হতে লাগল। খুব ভালো কাজ করত। কয়েক বছর পরে সে বড়-সায়েব হয়ে গেল। তারপর দিল্লীর হেড-অপিসে গিয়ে দেখে, তার সেই স্বামীটি সেই অপিসের একজন খুব ছোট সায়েব হয়ে বিরাজ করছেন।

তখন বড়-সায়েব তাকে শক্ত শক্ত কাজ আর কড়া কড়া নোট দিতে লাগলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জম্মু না কোথাকার যেন খুব অসুবিধার কোনো জায়গায় বদলি করিয়ে, নারীজাতির সম্মান বজায় রাখলেন।

ভূ—ভূত!

আমাদের পাড়ায় একটা পুরনো বাড়ি আছে, তার বয়স হয়তো দু-শো বছরের বেশি হবে। সেখানে কেউ থাকতে চায় না। তাই বলে যেন কেউ ভেবে না বসেন যে বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। মোটেই তা নয়। তবে রাতে কেউ সামনের বারান্দাটাতে যায় না। সবাই বলে সেখানে নাকি লম্বা কালো কোট পরা এক রোগা সায়েব পাইচারি করে। তার সমস্ত শরীরটা স্পষ্ট দেখা যায়, বাদে পায়ের পাতা দুটো। পায়ের কব্জি দুটো মেঝের ওপর বসানো থাকে, তাই দিয়েই সে পাইচারি করে। বিকট দেখায়। কিন্তু সে কাউকে কিছু বলে না। তবু কিছুদিন ঐ রকম দেখার পর, ভাড়াটেরা বাড়ি

ছেড়ে চলে যায়। আবার নতুন ভাড়াটে আসে।

আমাদের পাড়ার এক ফিরিঙ্গি বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম যে ওর ঠাকুরদা অনেক দিন ঐ বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন। ঠাকুরদার ছোটবেলাতেও রোগা সায়েব ঐ বারান্দায় পাইচারি করত। কিন্তু তখন তার জুতোটুতো সব দেখা যেত। তারপর দেখা গেল বেশি বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল দাঁড়ায়। সেই জল ক্রমে বারান্দার ওপর উঠতে আরম্ভ করল। অগত্যা এক প্রস্থ ইঁট বসিয়ে বারান্দাটাকে উঁচু করা হল। রোগা সায়েব বোধ হয় অতটা টের পায়নি, তাই সে অভ্যাসমতো পুরনো মেঝেটার ওপরেই হাঁটে। কাজেই জুতো দেখা যায় না।

কলকাতার পথেঘাটে ট্রামে-বাসে যে এত অসম্ভব বেশি লোক, তাদের সকলেই সত্যিকার মানুষ কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ট্রামে বাসে যেখানে ধরে ঝুলবার মতো-ও এক ইঞ্চি জায়গা নেই, সেখানেও কি করে অনেকে লট্‌কে থাকতে পারে, এ আমার বোঝার বাইরে। শুনেছি একবার নাকি এক পণ্ডিতমশাই অনেক

boiRboi.net

কষ্টে ছাতার বাঁটটি বাসের জানলার শিকে আটকিয়ে কোনো রকমে ঝুলে আছেন, এমন সময় টের পেলেন কে যেন তাঁর মেরজাইয়ের পকেট হাতড়াচ্ছে!

ফিরে দেখে কালো কুচ্‌কুচে, রোগা টিং-টিঙে এক ছোকরা, কিছু না ধরে শূন্যে ঝুলে আছে। পণ্ডিতমশাই এমনি আঁৎকে উঠলেন যে ছাতার বাঁট থেকে হাত ফস্‌কে, আরেকটু হলেই বিতিকিচ্ছিরি এক কাণ্ড করে বসতেন, কিন্তু শূন্যে-ঝোলা ছোকরা খপ্‌ করে তাঁর হাত ধরে, আবার ছাতার বাঁটে লট্‌কে দিল।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মন তোমার এত ভালো, তবু লোকের পকেট হাতড়াও কেন?' ছেলেটা ফিক্‌ করে হেসে বলল, 'কি করব, অব্বেস!' এই বলে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আরেক ভদ্রলোক, ঝমঝম বিষ্টি মাথায় নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বড়বাজারের এক গলি দিয়ে চলেছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, তাঁর সামনে একটা লোক একপাল ছাগল ভেড়া নিয়ে যাচ্ছে। সবাই ভিজে চুপ্‌পুড়, এমন সময় একটা পড়ো বাড়ি দেখা গেল। ভদ্রলোক শুনেছিলেন যে এই রকম বাড়িই বর্ষাকালে লোকের ঘাড়ে ভেঙে পড়ে, তাই একটু ঘাবড়াচ্ছিলেন।

তারপর যখন দেখলেন সেই লোকটা ছাগল-ভেড়া সুদ্ধু দিব্যি সুন্দর পড়ো বাড়ির দাওয়ায় উঠে পড়ল, উনিও সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। উঠে, গা থেকে জল ঝেড়ে, একটা বিড়ি ধরালেন। তাই দেখে লোকটির চোখ চকচক করে ওঠাতে, তাকেও একটা বিড়ি দিলেন। দুজনে একটুক্ষণ আরামে বিড়ি টানবার পর, ভদ্রলোক বললেন, 'এ জায়গাটা নাকি ভালো নয়।'

লোকটি বলল, 'ভালো তো নয়ই। এ পাড়ার কেউ এখানে পা দেয় না। বিষ্টির জলে ভেসে গেলেও না। ভারি বদনাম এ বাড়ির।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি ভূতটুতে বিশ্বাস করি না।' লোকটির বিড়ি খাওয়া হয়ে গেছিল, মাথাটুকু ফেলে দিয়ে বলল, 'তা আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি।' এই বলে ছাগল-ভেড়ার পাল সুদ্ধু অদৃশ্য হয়ে গেল! ভদ্রলোক-ও জল-ঝড়ে বেরিয়ে পড়ে ছুটতে লাগলেন।

ভবানীপুরে একটা পুরনো বাড়ি ছিল, ভাগে ভাগে ভাড়া দেওয়া। বাড়ির গিন্নির ছেলেপুলে ছিল না; স্বামীর সঙ্গে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি লেগেই থাকত। ঝগড়া হলেই স্বামী দুম-দাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন আর সে রাতে ফিরতেন না। ভয়ে ভাবনায় গিন্নির প্রাণ যায় আর কি! তখন তিনি তিনতলার রান্নাঘরের পাশে এক টুকরো খোলা ছাদে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, দেবতাকে ডাকতেন।

হঠাৎ দেখতেন পাশের ভাড়াটেদের ছোট্ট ছাদে তিন-চারটে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে দুপুর রাতে মহা হুল্লোড় লাগিয়েছে। সঙ্গে আবার কতকগুলো কুকুর-বেড়াল। দেখে দেখে তাঁর মন ভালো হয়ে যেত। ছেলে-মেয়েগুলো টপাটপ মধ্যিখানের পাঁচিল টপ্‌কে এদিকে এসে, তাঁর কোলে-পিঠে চাপত আর হিন্দিতে ইংরিজিতে মিশিয়ে

কি যে না বলত, তার ঠিক নেই। কোথায় নাকি চমৎকার ফল-বাগান আছে, ঝরণা আছে, আণ্টিকে সেখানে নিয়ে যাবে। ছিঃ, আর কে'দো না, ডিয়ারি!

তারপর ওঁর স্বামী বদলি হয়ে গেলেন, ওঁরাও ও-বাড়ি ছেড়ে পশ্চিমে চলে গেলেন। তারপর প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর কেটে গেল। ততদিনে স্বামীর মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, গিন্নিও অনেক বেশি সুখী। একটি অনাথ মেয়েকে মানুষ করে, বিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় এসে হঠাৎ মনে হল, সেই বাড়িটা একবার দেখে আসি। গিয়ে দেখেন ঘর-দোর আরো জীর্ণ, রং-ওঠা। মনে হয় এই বাইশ বছরে কোথাও এক পোঁছ পালিশ পড়েনি।

গেলেন ওঁদের সেই তিনতলার পুরনো ফ্ল্যাটে। এখন সেখানে এক বুড়ি থাকেন। তিনি বললেন, 'তাঁর স্বামী বছর দশেক গত হয়েছেন, ছেলে-বৌ বোম্বাইতে চলে গেছে, বড়ই একা পড়েছেন। তবে পাশের বাড়ির এক গাদা ছেলে-মেয়ে, কুকুর-বেড়াল রাতে ভারি মজা করে।'

এবার গিন্নি আর কৌতূহল রাখতে না পেরে, একটা টুল টেনে নিয়ে পাশের ছোট ছাদটিতে গিয়ে নামলেন। তারপর উল্টো দিকের পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলেন, ছেলেমেয়েগুলো কোত্থেকে আসে। দেখলেন পাঁচিলের ওপাশে খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। ওদিকে কোনো ঘরের চিহ্ন নেই, জায়গাও নেই। পাশ দিয়ে একটা গলি চলে গেছে।

ইউরোপিয়ান্‌স্‌ ওন্‌লি

বহুকাল আগে অনেক ট্রেনে দুটো করে বিশেষ থার্ড ক্লাস্‌ গাড়ি থাকত। একটা হল পুরুষদের জন্য। তার দরজার ওপরে লেখা থাকত—'ইউরোপিয়ান্‌স্‌ ওন্‌লি'। অন্যটার দরজার ওপরে থাকত, 'ইউরোপিয়ান লেডিজ ওন্‌লি।' বলা বাহুল্য এগুলো সায়েব-মেমদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। দিশী মহিলাদের জন্যেও বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা ছিল, তার দরজার ওপর লেখা ফিমেল্‌স্‌ আর একপাশে একটা ছবি বাঁধানো থাকত। হাফ্‌-ঘোমটা দেওয়া একজন দিশী মহিলা। তাই দেখেই বোঝা যেত এতে করে কারা যাবে।

এখন মুশকিল হল গিয়ে সায়েব-মেম চেনা যাবে কি দিয়ে? পোষাক ছাড়া আবার

boiRboi.net

কি দিয়ে? রং তো সক্কলের মিশ্-কালো! কাজেই নিয়ম হল প্যান্ট পরে গেলেই সায়েব, গাউন পরে গেলেই মেম। এক দিন হয়েছে কি, চাটগাঁ মেল ছাড়ব-ছাড়ব করছে, তিল ধারণের জায়গা নেই। এমন সময় ধুতি পরা এক ছোকরা হন্ত-দন্ত হয়ে দৌড়ে এসে সামনের গাড়িটার হাতল ধরেছে। অমনি ভেতর থেকে কুচকুচে কালো সায়েব গর্জে উঠেছে, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ম্যান্? কান্ট ইউ রীড্! দিস্ ইজ্ ফর ইউরোপিয়ান্স্ ওন্লি!' ছোকরা এক গাল হেসে বলল, 'রোসো রোসো সায়েব, বিকামিং ইউরোপিয়ান ইমিডিয়েট্লি!' অর্থাৎ, 'দাঁড়াও সায়েব, এক্ষুনি ইউরোপিয়ান বনে যাচ্ছি!' এই বলে প্ল্যাট্ফর্মে দাঁড়িয়েই স্যুটকেস্ থেকে পেণ্টেলুন বের করে, ধুতির ওপর পরে নিয়ে, সায়েব বনে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল।

আরেকবার কবি ও নাট্যকার ডি এল রায়ের ছোট শালী, সুরসিক গিরীশ শর্মার স্ত্রী এবং আমার ননদ তাঁর পেয়ারের আদিবাসী দাসী লক্ষ্মীকে নিয়ে রাঁচী থেকে আসছেন। ভদ্রমহিলার রং মেমদের মতো—বলতে মনে হল বক্রেশ্বরে দেখলাম একটা স্মৃতি-ফলকে লেখা—'মেমবরণী দেবী'—সে যাক গে, মোট কথা মহিলা ছিলেন পরমাসুন্দরী আর লক্ষ্মী ছিল মিশ্-কালো, ঝকঝকে সাদা দাঁত, তেল-

boiRboi.net

চুক্‌চুকে চুলে জবাফুল গোঁজা, গালভরা হাসি।

দুজনে গুছিয়ে বসেছেন, এমন সময় এক কালো মেম তার দুই কালো কন্যে নিয়ে ঐ গাড়িতে উঠতে গেছে। হঠাৎ মেজদিদির ওপর চোখ পড়াতে, নাক সিঁটকে, দু-হাত পেছিয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'উঃফ্‌! নেটিভ্‌স্‌! অন্য গাড়িতে চল!'

সঙ্গে সঙ্গে মেজদিদিও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে—সেকালে জানলায় শিক থাকত না—ডাকতে লাগলেন, 'ও মেম! ও মেম! চলে যেও না! এখানেই এসো! এই দেখ, তোমার মতো মেম আমারো আছে!'

মেম ফিরে দেখে জানলায় মেজদিদির ফরসা সুন্দর মুখের পাশে, লক্ষ্মীর কালো মুখের বত্রিশ পাটি দাঁতের বাহার! প্ল্যাটফর্মের লোকরা হো-হো করে হাসতে লাগল আর মেম রাগের চোটে বেগ্‌নি হয়ে, দাপাতে দাপাতে অন্য গাড়িতে গিয়ে উঠল।

তবে এ-সব হল গিয়ে আমার জন্মের আগের ঘটনা। এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, হাল-চাল পাল্টে গেছে। কয়েক বছর আগে বালিগঞ্জের এক ফ্যাশানেব্‌ল্‌ পাড়ায়, মিসেস্‌ বনামি বলে একজন কালো মেম একটা নার্সারি স্কুল খুলে বসলেন।

বাড়ির দেয়ালে নীল গোলাপি রং হল। কাঠের দোলনা, দোলা-ঘোড়া, লোহার পিছ্‌লে-পড়া-জিনিস, খুদে নাগরদোলা ইত্যাদি বারান্দায়, উঠোনে সাজানো হল। ঘরে ঘরে ছোট্ট ছোট্ট নানা রঙের চেয়ার-টেবিল বসল। মস্ত মস্ত গোল, তিন-কোণা, চার-কোণা কি সব এল। দু-জন আয়া রাখা হল। গেটের ওপর সাইন-বোর্ড টাঙানো হল—বনামি বেবিজ!

ব্যস্‌! আর কি চাই! শুধু ঐ পাড়ারই নয়, আশপাশের তিন পাড়ার মা-বাবারা লাইন দিয়ে ছেলেমেয়ে ভরতি করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। নাকি মেমদের শিক্ষাই অন্য ব্যাপার, তার সঙ্গে গায়ের রঙের কোনো সম্পর্ক নেই। হপ্তা ঘুরতে না ঘুরতে বনামি বেবিজের একটা সীট্‌ও খালি রইল না। লম্বা এক ওয়েটিং লিস্ট হল। পঁচিশ টাকা জমা দিয়ে অনেকেই তাঁদের কোলোট্‌-পরা বেবিদেরও নাম লিখিয়ে রাখলেন। ইস্কুল গম্‌গম্‌ করতে লাগল।

সবাই মিসেস্‌ বনামির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেমন প্লীজ্‌ থ্যাংকু বলতে শেখায়। দিদিমণির বদলে ম্যাম্‌ বলতে হয়। নীল সাদা পোষাক জুতো মোজা পরতে হয়। ইংরিজিতে টুইংকেল টুইংকেল গান করতে হয়। বাড়ি থেকে আনা দুধ বিস্কুট খাবার আগে হাত ধুয়ে কোলে রুমাল পেতে বসতে হয়। মেম না হলে এ-সব হত? এর জন্যে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে কিছু বেশি নয়।

তিনটে বছর চমৎকার চলল ইস্কুল। মিসেস্‌ বনামির কি সুনাম। শেষটা এমন দাঁড়াল যে তাঁর পরামর্শ না নিয়ে কেউ কোনো কাজে হাত দিত না, ছেলেমেয়ের বিয়ে পর্যন্ত হত না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ওপর মেমের মনটাও ছিল বড় ভালো। ঠিক এই সময় পাড়ার মাতব্বর বংকুবাবুর নাতনি এসে সব ভেস্তে দিয়ে গেল।

সেদিন স্কুলের জন্মদিন। বংকুবাবু নাতনি মঞ্জুকে সুদ্ধ ধরে নিয়ে গেলেন।

pathagar.net

বললেন, "তোরা ছাই এম্-এ পাস্ করেছিস্। আমাদের মিসেস্ বনামিকে দেখলেও তার চেয়ে বেশি শিক্ষা হয়!" নাতনি একটু হাঁড়ি-মুখ করেই গেছিল, কিন্তু সেখানে মিসেস্ বনামিকে দেখেই, দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে, তাকে বুকে জড়িয়ে বলল, 'ও কি রে, পুঁটি, তুই আবার মেম হলি কবে? ও দাদু, পুঁটি যে আমাদের দাশবাবুর মেয়ে, মনে নেই সেই যে আমার সঙ্গে পড়ত?'

ব্যস্, হয়ে গেল। অমন আদর্শ মিসেস্ বনামি অমনি মন্দ হয়ে গেল! চল্লিশ টাকা মাইনে দিয়ে তো আর দাশবাবুর মেয়ের ইস্কুলে ছেলেপুলে পাঠানো যায় না। ইস্কুল উঠে গেল! মঞ্জুর মহা দুঃখ। তার জন্যেই এই সর্বনাশটি হল! পুঁটি হেসে বলল, 'তাতে কি হয়েছে? হাজার পঞ্চাশেক জমে গেছে। তাই দিয়ে ঐখানেই মাদার্স ওন খুলব।' নাকি খুব ভালো চলছে সেটি।

ধাপ্পাবাজ ইত্যাদি

খুব কম বয়সে আমার বিয়ে হয়নি। এম্-এ পাস্ করলাম, এক বছর শান্তি-নিকেতনে, এক বছর কলকাতায় অধ্যাপনা করলাম। তারপর বিয়ে হয়ে যখন সংসার করতে লাগলাম, তখন দেখি কিছুই জানি না। সংসারের হাল-চালই বুঝি না। সবাইকে বিশ্বাস করি। ভবানীপুরে একটা দোতলার ফ্ল্যাটে থাকতাম। দুপুরে চাকরবাকররা নাওয়া-খাওয়া করতে চলে যেত। তখন আমি একা থাকতাম।

একদিন এক ফিটফাট বাবু এসে উপস্থিত। বলল, 'বাড়িওয়ালা পাঠিয়েছেন। তাঁর সব ভাড়াটেদের পাখা আমরা সারিয়ে রং করে দিই।'

আমি বললাম, 'আমাদের নিজেদের পাখা। ও-সবের দরকার নেই।'

লোকটি বলল, 'আহা, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না, মা, টাকাকড়ি দিতে হবে না। বাড়িওলার সঙ্গে আমাদের কোম্পানির এইরকম ব্যবস্থা আছে, নিজেদের খরচায় পাখা খুলে নিয়ে গিয়ে, একেবারে নতুন বানিয়ে আবার টানিয়ে দিয়ে যাব। সাত দিন লাগবে।'

আমি বললাম, 'আমাদের সব পাখা আনকোরা নতুন, কাজেই আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। ধন্যবাদ।' এই বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। বাড়িওয়ালা আমাদের আত্মীয়, তাঁকে ব্যাপারটা বলা হল, পাছে কিছু মনে করেন। তিনি তো আকাশ থেকে

boiRboi.net

পড়লেন ! 'সে কি ! আমি তো কারো সঙ্গে ও-রকম কোনো ব্যবস্থা করিনি ! ভাগ্যিস্ পাখাগুলো দাওনি, দিলে আর ফিরে পেতে না।'

শুনে আমি হাঁ ! লোকটাকে একটুও সন্দেহ করিনি। পুরনো পাখা হলে হয়তো দিয়েই ফেলতাম। বাড়ির মালিক বললেন, 'খুব সাবধানে থেকো। আজকাল যা কাণ্ড হচ্ছে, কাউকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। এই তো সেদিন যোধপুর হাউসে মস্ত এক লরি নিয়ে এক ফিরিঙ্গি সায়েব, লম্বা একটা ফর্মা দেখিয়ে দারোয়ানকে বলল,

'মালিকরা বড় দিনে কলকাতায় আসবেন। আমাদের আপিসে চিঠি দিয়েছেন সব পাখা খুলে সাফ করে তেল দিয়ে, নতুন রং দিয়ে আবার টাঙিয়ে দিতে হবে। এই দেখ মালিকের চিঠি আর এই যে আমাদের বড় সায়েবের সই দেওয়া রসিদ।'

দারোয়ান দেবনাগরি ছাড়া কিছু পড়তে পারে না। তার ওপর সায়েব আর লরি আর ইংরিজিতে সই দেওয়া কাগজ দেখে হক্‌চকিয়ে ঘরদোর খুলে দিল। লরিতে সিঁড়ি, হাতিয়ার, মজুর সব ছিল। দেখতে দেখতে ৪২টি পাখা নামিয়ে লরিতে তুলে, সিঁড়ি ধরে থাকার জন্য দারোয়ানকে দু-টাকা বখশিস্ দিয়ে, দিব্যি সুন্দর চলে গেল।

দুপুরে এস্টেট্ ম্যানেজার এসে ব্যাপার দেখে চক্ষুস্থির ! দারোয়ানকে ধমক-ধামক করে কোনো লাভ হল না। তাঁর নিজের ওখানে সকাল থেকে থাকার কথা। শেষ পর্যন্ত পুলিসে খবর দেওয়া হল। রসিদে লেখা—৪২টি পাখা পেলাম, তারপর

দুষ্পাঠ্য এক সই! বলা বাহুল্য কোনো ফল পাওয়া গেল না। মোট কথা, কাউকে দরজা খুলো না।'

এর পর কিছু দিন কেটে গেল, আমিও অনেকটা পোক্ত হয়ে উঠলাম। নির্দোষ কারিগর, মিস্ত্রি ইত্যাদিকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলাম। এমন সময় এক দিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বেয়ারা হারাণ একজন আরমানি যুবককে নিয়ে এল। সাদা ইউনিফর্ম পরা ভারি ভদ্রগোছের চেহারা। সে এসেই বলল, 'মাপ করবেন, কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি আপনাদের বাড়িতে বে-আইনী মদ চোলাই হয়। আমি আবগারি বিভাগ থেকে এসেছি, এই দেখুন আমার অর্ডার। আপনাদের বাড়ি ইন্সপেকট করব।'

আমি বেজায় আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বললাম, 'বেশ তো, দেখুন খুঁজে যদি কিছু পান। আমি তো কিছু পাইনি।' হারাণকে বললাম, 'বাড়িঘর দেখিয়ে দে।' হারাণ তাকে সঙ্গে করে খাবারঘর, রান্নাঘর, শোবার ঘর, স্নানের ঘর সব দেখাল। সমস্ত পরিষ্কার ফট্‌ফট্‌ করছে, কোথাও বেআইনী কিছু নেই।

তখন লোকটি বলল, 'নিচে গুদোম নেই?' বললাম, 'আছেই তো। গ্যারাজ আছে, বাবুর্চির ঘর আছে, বেয়ারার ঘর আছে। দেখে আসুনগে।' তার পণ্ডশ্রমের কথা ভেবে আমার বেজায় হাসি পাচ্ছিল। হারাণ তাকে সব খুঁটিয়ে দেখাল।

সত্যিই লোকটি ভারি ভদ্র। একটু পরে ফিরে এসে আমাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইল। বলল, 'এই রকমই হয়। উড়ো খবর পেয়ে আমরা তল্লাশি করি, লোকে বিরক্ত হয়। আবার মাঝেমাঝে দুষ্কৃতকারীদের ধরেও ফেলি। কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম, এইরকম আমাদের ডিউটি। 'গুড্-নাইট।'

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আমার স্বামী চা খেতে বসলে, আমি ফলাও করে ঐ গল্প করছি, হারাণ চা দিচ্ছে। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ভাগ্যিস্ আগে থাকতে খবর পেয়ে হাঁড়াগুলোকে পাশের গলির পোড়ো বাড়িতে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল! নইলে তো হয়েই গেছিল!!'

শুনে আমার চক্ষুস্থির! 'বলিস্ কি রে! কিসের হাঁড়া?' হারাণের জিবের জড়তা ছিল। আস্তে আস্তে বলল, 'ঐ যে বাবুর্চির আর আমার মদ চোলাইয়ের বাসনপত্রগুলো।'

বেজায় রেগে গেলাম আমরা। হারাণকে পই-পই করে বলে দিলাম, 'খবরদার এমন কাজ করবি না। চাকরি যাবে, জেলে যাবি, সর্বনাশ হবে। আর ঐ বাবুর্চিটার সঙ্গ ছাড়।'

এর পর বাবুর্চি আর হারাণ দুজনেই চাকরি ছেড়ে দিল। পোস্টাপিশে হারাণের নাকি ১০০ টাকা জমেছে, তাই দিয়ে ওরা ব্যবসা করবে। কিসের ব্যবসা জিজ্ঞেস করিনি। মদের নিশ্চয়।

এর চল্লিশ বছর বাদে ঝুরঝুরে বুড়ো শরীর নিয়ে হারাণ একদিন দেখা করে বলে গেল, 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন, মা, ওতে সত্যিই সর্বনাশ হয়!'

শান্তিনিকেতন ১৯৩১

১৯৩১ সালে এম্-এ পাস করে শান্তিনিকেতনে গেছি মাস্টারণী হয়ে। ওঁরা অবিশ্যি বলতেন অধ্যাপিকা। পঁচাশি টাকা মাইনে পাই; তার থেকে বোর্ডিংএ থাকা-খাওয়া বাবদ কুড়ি টাকা বাদ যায়। বাকি টাকা দিয়ে কি যে করব ভেবে পাই না, তখন ধারে-কাছে না ছিল দোকান-পাট, না ছিল হোটেল-রেস্তোরাঁ। থাকলেও কোনো সুবিধে হত না জানি। কারণ ওখানে সবাই সাদাসিধে কাপড় পরত; বেশির ভাগ খালি পায়ে হাঁটত; চাঁট ছিল পোষাকী ব্যাপার, কলকাতা থেকে আমরা শিল্পী

boiRboi.net

সত্যেন বিশীকে দিয়ে আনাতাম। দেড় টাকা দিয়ে চমৎকার সব জিনিস পাওয়া যেত।

সে যাই হোক গে, কাজটি ভারি ভালো লাগত। দার্জিলিং-এ যখন কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন কিছু খুলে বলেননি। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েই নিজের হাতে চিঠি লিখলেন—আশা অধিকারী এক বছরের ছুটি নিয়েছে, তুমি এসে ঐ একটা বছর শিশু-বিভাগের ভার নাও। সে আর বলতে। গরমের ছুটির পর গিয়ে জুটেছিলাম।

কিন্তু ততদিনে আমার সন্দেশে প্রকাশিত ছোটদের গল্প পড়া ছাড়াও দেখলাম আমার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছেন। ফলে শিশু বিভাগে গল্প বলি, একটু বড় ছেলেদের ইংরিজি পড়াই আর বি-এ ইংরিজি অনার্সেরও ক্লাস নিই।

প্রথম দিন দশম শ্রেণীর ইংরিজি ক্লাস নিতে গেছি। আমবাগানের দক্ষিণে শাল-বীথি, সেখানে একটা বড় ফটক, তার ওপর মধুমালতী লতা বেয়ে উঠেছে। জায়গাটি আমার ভারি পছন্দ। মন্দ মন্দ বাতাস দেয়, ফুলের গন্ধ ভুরভুর করে। তা হলে হবে কি! পড়ুয়াদের কাছে শুনলাম যে ফটকের তলাটা নাকি জগদানন্দ-বাবুর অংকের ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট মানে তিনি নিজেই ঐ রকম নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। কি আর করি, অগত্যা মহুয়াগাছের নিচে জায়গা নিলাম। আশ্চর্য মানুষ জগদানন্দ রায়, নানা বিষয়ে পরম পণ্ডিত, লেখক, চমৎকার মানুষ, ছাত্রগত-

প্রাণ। তবে রেগে গেলে মাঝে মাঝে যাদব চক্রবর্তীর মোটা অংকের বই ছুঁড়ে মারতেন। দু-একবার মারবার পর মলাট আল্‌গা হয়ে যেত। নিজের বই আনতে ভুলতেন, এদিকে কেউ বই দিতেও চাইত না। শেষটা মনিটর রোজ একটা ছেঁড়া বই সঙ্গে আনতে লাগল। কিন্তু কোনো ছাত্রছাত্রীর কোনো কিছুর দরকার হলে, খালি হাতে তাঁর কাছ থেকে ফিরত না।

বসবার জন্যে একটা নতুন শতরঞ্জির আসন পেয়েছিলাম। সেটি পেতে মহুয়া তলায় প্রথম দিন ভয়ে ভয়ে গিয়ে বসলাম। আমার সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে দু-সারি

boiRboi.net

পড়ুয়া বসল। ছেলেরা ডান দিকে, মেয়েরা বাঁ দিকে। নতুন এসেছি, সবে আসনটা পেয়েছি, তখনো বইটই পাইনি। পড়ুয়াদের কাছে একটা বই চাইলাম। ছেলেমেয়েগুলো একটুক্ষণ এ ওর দিকে চেয়ে, দ্বিধাভরে একটা ছেঁড়ামতো বই দিল। তখনো বই-ছোঁড়ার কাহিনী শুনিনি, তাই ওদের দো-মনা ভাব দেখে একটু অবাক হলাম।

বই খুলে সেদিনকার পড়ার জায়গাটা বের করে দেখি সব শক্ত কথাগুলোর তলায় পেন্‌সিলের দাগ, পাশে মানে লেখা। এক জায়গায় দেখি Soot শব্দটির মানে লেখা 'ঝোল'। বিস্মিত হয়ে বইয়ের মালিকের নামটা দেখে নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, রাসবিহারী, Soot মানে ঝোল লিখেছ কেন?' তাই শুনে সকলের কি হাসি!

পোড়োরা বলল, 'ও বাঙাল দেখুন। রান্নাঘরে "মাছের ঝুল, মাছের ঝুল" করছিল বলে আমরা বুঝিয়ে বললাম, 'ঝুল না, ঝোল বল!' তারপর তনয়দা ক্লাসে যেই বলেছেন Soot মানে ঝুল, ও নিশ্চয় ভেবেছে উনিও বাঙাল, তাই লিখে রেখেছে ঝোল।'

আরেকদিন আরেকটু ছোট ছেলেদের ইংরিজি গ্রামার পড়াচ্ছি। শীতকাল ; মুখে মাথায় টুপটাপ করে পাকা মহুয়ার ফল পড়ছে। আমারি পড়ানোতে মন যাচ্ছে না, ওদের কথা ছেড়েই দিলাম। তারি মধ্যে আশ্চর্য হয়ে দেখি একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে, আমার দিকে পাশ ফিরে, শালগাছে ঠেস দিয়ে বসে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি একটা বই পড়ছে। পড়তে পড়তে তার চুল খাড়া হয়ে উঠছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, থুতনি ঝুলে পড়ছে। ও বই কখনোই ইংরিজি গ্রামার হতে পারে না।

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কানু, কি পড়ছিস্ নিয়ে আয়।' কানু তখুনি বইটা হাঁটুর তলায় লুকিয়ে ফেলে, কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'ইয়ে—মানে—এটা আপনি না পড়লেই ভালো হয়।' আমারও কেমন জেদ চেপে গেল। কড়া গলায় বললাম, 'নিয়ে

আয় বলছি !'

বই হাতে নিয়ে দেখি মলাটের ওপর অন্ধকার এক গুহার ছবি। গুহার মধ্যে থেকে বিকট একটা ড্রাগনের মতো জানোয়ার মুখ বের করে রয়েছে। তার নাক দিয়ে আগুনের হল্‌কা ছুটছে। ওপরে লাল হরপে লেখা 'তিব্বতী গুহার ভয়ঙ্কর' আর নিচে লেখা 'রোমাঞ্চ সিরিজ, ২২নং'। আমি বললাম, 'বইটা আমার কাছে থাক। কাল নিস্‌। ক্লাসে গল্পের বই আনা ভারি খারাপ।'

বিকেলে প্রায় রোজই আমরা কেউ কেউ কবির কাছে যেতাম। সান্ধ্য আসর আরম্ভ হতে তখনো দেরি। কবির জাব্বা-জোব্বা পরা হয়নি। গায়ে একটি ঢিলে হাতার মিহি খদ্দরের পাঞ্জাবী। ঠিক সাদা নয়, সাদা জমির ওপর ছাই রঙের সূক্ষ্ম ডোরা কাটা। হাতা দুটি কনুই অবধি গুটোনো। ফরসা বলিষ্ঠ বাহু দেখে আশ্চর্য হতাম। সাদা ধুতি। পায়ে কটকী চটি, কখনো সাদামতো, কখনো গাঢ় নীল, তাতে ছুঁচের কাজ করা।

আমাকে দেখেই সারাদিনের কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করতেন, নানারকম রসের গল্প বলতেন। আমার সঙ্গে থাকত আমার বাল্যবন্ধু পূর্ণিমা ঠাকুর, দীপু ঠাকুরের নাতনি। সে-ও পড়াত ওখানে। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ ইংরিজি ক্লাসে কি করালে ?' বললাম, 'গরুর বিষয়ে রচনা লেখালাম।' বললেন, 'তা, তারা কি লিখল ?' বললাম, 'একজন লিখল, The cow is a domesticated vegetarian !'

শুনেই উনি খাড়া হয়ে বসে বললেন, 'এ্যাঁ ! বল কি ! ওটা যে আমার বর্ণনা ! আমিও তো domesticated vegetarian !' এইরকম আমুদে মানুষ ছিলেন। সে সময় উনি নিরামিষ খেতেন, প্রচুর ফল খেতেন। ভোরে উঠতেন ; উঠেই ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে বসতেন। উদয়ন বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা রংচং খড়খড়ি দেওয়া বারান্দা দেখা যায়। আজকাল সেটি অষ্টপ্রহর বন্ধ থাকে দেখি। তখন ও-দিক দিয়ে যাওয়া-আসা করা যেত। পথ দিয়ে যেতে যেদিন গলা খাঁকারির শব্দ শুনতাম, সেদিন সাহস করে ঢুকে পড়তাম। আর যেদিন দেখতাম সব নিস্তব্ধ নিঝুম, সেদিন বুঝতাম কবি সৃষ্টির কাজে মগ্ন আছেন। নিঃশব্দে চলে আসতাম। কখনো বা দেখতাম আমারও আগে কেউ এসে গেছেন, সেদিন আর ভিতরে যাবার চেষ্টা করতাম না।

মনে আছে একদিন দেখেছিলাম, কবির আরামকেদারার সামনে, নিচু শ্বেত-পাথরের জলচৌকির ওপর সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরা অপূর্ব সুন্দর একজন পুরুষ বসে। আমাকে দেখে কবি ডাকলেন, 'এসো এসো, এই সুন্দর মানুষটির সঙ্গে আলাপ কর। এর নাম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।'

আমার মনে হল এমন সুন্দর মানুষ বাস্তবিকই আর দেখিনি। কবি একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু মনে রেখো ও বিবাহিত।'

boiRboi.net

বোলপুরের রেল

ট্রেনে চাপলেই আমার মেজাজ অন্য রকম হয়ে যায়। অবিশ্যি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার রেলের দৌড়ও কমতে কমতে এখন কলকাতা থেকে বোলপুর আর বোলপুর থেকে কলকাতায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাই বলে রেলযাত্রার রোমাঞ্চ একটুও কমেনি। হাওড়া থেকে বোলপুরের দূরত্ব ৯৫ মাইল হলেও, মনে হয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গেলাম। কালো এঁটেল মাটির বদলে দেখা যায়, লাল ঝরা মাটি ! লতা-গুল্মের ঝাড়ের বদলে ভাঙা ডাঙার ওপর দেখা যায় বেঁটে বেঁটে খেজুর-গাছ। রেলগাড়িও বাঁধের ওপর না চলে, কাটিং-এর মধ্যে নামে। সহযাত্রীদের ধরনটাও দেখি অন্য রকম। কালো, লম্বা, কোঁকড়া চুল, সাজের ঘটা কম, কিন্তু চালাক-চালাক মুখ, বন্ধু-সুলভ হাব-ভাব।

এই দুই সীমানার মধ্যিখানে ৮০-৯০ মাইল পথের বিচিত্র ব্যাপার। একবার বর্ধমানে গাড়ি ছাড়ব-ছাড়ব করছে, এমন সময় একসঙ্গে অনেকগুলি যাত্রী উঠলেন। একজন ধুতি-পাঞ্জাবী পরা আধা-বয়সী ভদ্রলোক, দুঃখী-দুঃখী মুখের একজন ৪০-৫০ বছরের মহিলা, তাঁর সঙ্গে একটি বছর তিনেকের খুকী আর কট্‌কটে হলুদ হাওয়াই-শার্ট গায়ে এক লম্বা-চুলো ছোকরা। জায়গা-টায়গা খুব বেশি ছিল না। তারা আমাদের পাশেই দাঁড়াল। ভদ্রমহিলাকে একটু বসবার জায়গা করে দেওয়া হল। খুকীও বসল।

দুঃখী-দুঃখী মুখের ভদ্রমহিলা হলদে-শার্ট ছোকরার সামনে একটা বড় সাইজের হ্যান্ড-ব্যাগ খুলে ধরলেন। হ্যান্ড-ব্যাগে পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট যেমন তেমন করে ঠাসা। ব্যাগের পেট ফুলো হয়ে আছে। ছোকরা তার ভেতর থেকে গোটা তিনেক দশ টাকার আর গোটা তিনেক পাঁচ টাকার নোট তুলে নিয়ে বলল, 'তাহলে এগুলো-ও নেব ?' এই বলেই পিছোতে পিছোতে শেষটা কামরা থেকে নেমেই গেল !

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা খোলা অবস্থাতেই হ্যান্ডব্যাগটাকে টাকাকড়ি সুদ্ধ আমাদের সামনের বেঞ্চিতে ফেলে, 'কোথায় গেল ? কোথায় গেল ?' বলে আর্তনাদ করতে করতে উঠি-পড়ি দরজার দিকে ছুটলেন। খুকীও এই বড় হাঁ করে তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল।

আমরা শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও কে ? আপনার ছেলে নাকি ?' বাধা পেয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'না না, আমার ছেলে হতে যাবে কেন ? এর আগে কখনো চোখেও দেখিনি। প্লাটফর্মে দেখা হল, বলল আমার ভাইকে চেনে। আমেদপুরে দুজনেই এক আপিসে চাকরি করে। সেখানে

BanglaBook.org

নাকি নোট ভাঙানো যায় না। তাই আমার নোটগুলো ভাঙিয়ে দেবে বলে কি না নোট নিয়ে গাড়ি থেকেই নেমে গেল!'

ভদ্রলোক বললেন, 'নিয়ে গেল আবার কি! আপনিই তো একরকম গছিয়ে দিলেন। বসুন। দেখি কি করতে পারি।' বলে তিনিও নেমে গেলেন।

আমরা ভদ্রমহিলাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'ও টাকার আশা ছাড়ুন। আপনার বাকি টাকাগুলোও আমেদপুর অবধি পেঁছবে কি না সন্দেহ। এতক্ষণ যে ভাবে ব্যাগটা খুলে ফেলে রেখে দিয়েছেন, আমরা যে-কেউ এক গোছা তুলে নিতে পারতাম!'

তিনি আঁৎকে উঠে ব্যাগ বন্ধ করলেন। খুকী 'খিদে পেছে' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

এমন সময় চলন্ত গাড়িতে খচ্‌মচ্‌ করে সেই ভদ্রলোক উঠে পড়ে, ভদ্রমহিলাকে তিনটে দশ টাকার তিনটে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'নিন্‌, ধরুন। কখনো কোথাও কোনো অচেনা লোককে বিশ্বাস করবেন না। এমন কি আমাকেও না।'

ভদ্রমহিলা তো অবাক্‌, 'ওমা! অচেনা কোথায়? বলল যে ভাইকে চেনে! নিজের থেকে আলাপ করল। পান কিনে দিল।'

আমরা আর থাকতে না পেরে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তাকে ধরলেন

BanglaBook.org

কি করে ?'

তিনি হাসলেন, 'তা-ও পারব না ? ঐ তো আমার কাজ। ২৫ বছর ওয়াচ্ অ্যান্ড ওয়ার্ডে আছি না ! বেরুবার ফটকে ক্যাঁক করে ধরেছি বাছাধনকে ! অমনি নোটগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পগার পার ! রেলওয়ে পুলিসকে জিম্মা করে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহলে এত কষ্টে পাওয়া ছুটিটা মাঠে মারা যেত। আর দেখলেন তো কি ইন্‌কম্পিটেন্ট ! ছিনতাই করবি তো হলুদ শার্ট কেন ? ভিড়ের সঙ্গে মিশে থাকতে হয় তাও জানিস্ না আবার চুরি করতে আসিস্ !'

আরেকবার যেই না জনাই রোডে গাড়ি থেমেছে, একজন যাত্রী বললেন, 'আবার রোড্ কেন ? জনাই নামই তো বেশ ছিল।' আরেকজন বললেন, 'তিন মাইল দূরে জনাই গ্রাম আছে কি না, তার সঙ্গে তফাৎ করবার জন্য স্টেশনের নাম জনাই রোড।'

তৃতীয় যাত্রী বললেন, 'মোটেই তিন মাইল নয়। বড় জোড় দেড় মাইল। আগের বক্তা বিরক্ত হলেন, 'বলছি মশাই পাক্কা তিন মাইল।' পরের বক্তাও তেরিয়া হয়ে উঠলেন, 'আজ্ঞে না মশাই, যা-তা বললে তো আর হবে না। দেড় মাইলের এক পা-ও বেশি নয়।'

কামরায় বেশ একটা গরম হাওয়া জমে উঠল। কোনো পক্ষেরি পৃষ্ঠপোষকের অভাব হল না। শেষ পর্যন্ত প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'কি মুশ্‌কিল, এতে এত তপ্ত হবার কি আছে ? আচ্ছা দেখাই যাক না, কার কথা ঠিক। আপনিই আগে বলুন অত নিশ্চয়তার সঙ্গে কি করে বলছেন দেড় মাইল ?'

সে বলল, 'আমি জানব না তো কে জানবে বলুন ? এক রকম বলতে গেলে আমি এখানকার একজন ইন্‌হ্যাবিট্যান্ট। আজকাল কলকাতায় থাকলেও এইখানেই আমার বাড়ি। ঐ পথের প্রত্যেকটা ইঁট-পাটকেল ঝোপ-ঝাড় নেড়িকুত্তো আমার চেনা।'

তখন অন্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তাহলে আপনিই বা তিন মাইল বলছেন কেন ?' ভদ্রলোক কাষ্ঠ হাসলেন, 'বলছি কি সাধে ! ঐ তিন মাইলের প্রত্যেকটা ইঞ্চি ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে হেঁটেছি বলে বলছি। দু-বছর আগে আমরা ফুট্‌বল ম্যাচ্ খেলতে এলাম। ওঁরা স্টেশন থেকে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে ট্রাকে চড়িয়ে খেলার মাঠে নিয়ে গেলেন। কি আর বলব মশাই, হেরে ভূত হয়ে গেলাম ! আর এনারা করলেন কি, আমাদের খেলার মাঠে ফেলে, ট্রাক্‌টি নিয়ে বিকট জয়ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রায় বেরুলেন ! অগত্যা হেঁটে স্টেশনে আসা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। হুঃ !'

মধ্যস্থ তখন বললেন, 'তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দূরত্বটা দুই মাইল।'

boiRboi.net

ডাক্তার

পৃথিবীতে—আর শুধু পৃথিবীতে কেন—আমাদের নিজেদের চারদিকেই—যত মজার ঘটনা ঘটে, অন্ততঃ যত মজার ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যায়, বলা বাহুল্য তার সবটুকু আকাট বাস্তব না-ও হতে পারে, সে সমস্ত যদি সংগ্রহ করে একের পর এক বলা যায়, তাহলে বোধ হয় দুনিয়ার সব রাগ দুঃখ হতাশা ক্ষোভ খেদ বিফলতা অন্ততঃ কিছুক্ষণের মতো দূর হয়ে যায়। সে-ই বা কম কি?

যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কে যেন একটা মিলিটারি গল্প বলেছিল, সেটার কথাই ধরা যাক। এক বেচারা সেপাইয়ের বেজায় দাঁত ব্যথা, খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, যুদ্ধ করা দূরে থাকুক। শেষ পর্যন্ত কাপ্তানের কাছ থেকে ছুটি আর অনুমতি-পত্র নিয়ে গেল সে ডাক্তারি বিভাগে।

সেখানে গিয়ে দেখে মিলিটারি ডাক্তার মহা চটে আছে—এত বেশি রুগী, এত কম সময়! ডাক্তারের সহকারী, সে-ও এক মিলিটারি ভদ্রলোক। তিনি ছুটে এলেন, 'আহা, এখানে না, এখানে না! যাও পাশের ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে রেডি হয়ে থাক। নাম ডাকলে এসো। আমাদের সময় বড় কম।'

সেপাই বলল, 'কাপড় ছাড়ব কেন? আমার তো দাঁত-ব্যথা—' সহকারী তেড়ে বললেন, 'বাজে বক না। যা বলছি তাই কর। তাই নিয়ম।'

পাশের ঘরে একজন সম্পূর্ণ উলঙ্গ লোক একটি ফাইল কোলে নিয়ে, টুলে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। সেপাইকে গজগজ করতে শুনে, মুখ তুলে সে বলল, 'অত গরম হবার কি আছে, মশাই? আমাকে দেখুন। আমি তো শুধু এই ফাইলটা দিতে এসেছিলাম।'

ডাক্তারি ব্যাপার বলতে আরেকটা গল্পও মনে পড়ে গেল। এক দাঁতের ডাক্তার বেজায় কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একের পর এক রুগী ঢুকছে, তাড়াতাড়ি তার কাজ সেরে দিচ্ছেন। সে যেতেই আরেকজন ঢুকছে। এমন সময় ঘেমো চেহারার একজন লোক ঢুকেই চেয়ারে না বসে, কাঁচুমাচু মুখে আমতা-আমতা করে কি যেন বলবার চেষ্টা করতে লাগল। রুগীরা হামেশাই ডাক্তারদের জ্ঞান দিতে চেষ্টা করে; তার ওপর এ রুগী নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটু দেরি করেই এসেছে। অকুস্থল বিলেতে, সরকারি রুগী, সরকারি ডাক্তার। ডাক্তারের ধৈর্যও খুব বেশি ছিল না। তিনি রুগীর কথায় কান না দিয়ে, তার কনুই ধরে, চেয়ারে বসিয়ে, হাঁ করিয়ে দেখেন মুখ-ভরা পচা দাঁত। সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌জেক্‌শন এবং পটাপট গোটা তিনেক উৎপাটন। তারপর ওষুধ লাগিয়ে, নিজের হাত ধুতে ধুতে প্রসন্ন গলায় বললেন, 'বাঃ, বেশ হল! হ্যাঁ,

এবার বলুন কি বলতে চাইছিলেন।'

রুগী আবার কাঁচুমাচ মুখে বলল, 'বলছিলাম কি, আমি রুগী নই। রুগী আমার পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। তাঁর জ্বর হয়েছে।'

মাঝে মাঝে ডাক্তাররা এমনি বেজায় ভালো হন যে হাসি পায়। আমাদের আত্মীয় শিল্পী সত্যেন বিশীর যখন কুড়ি বছর বয়স, তখন তাকে একরকম বিট্‌কেল হেঁচ্‌কিতে ধরল। সে আর কিছুতেই যায় না। তিন দিন ধরে সমানে চলল। সব রকম টোট্‌কা ওষুধ চেষ্টা করা হল। কে যেন বলে গেল নাক কান এক সঙ্গে চিপকে ধরে, দু-তিন ঢোক জলের সঙ্গে একটা হেঁচকি পার করে দিতে পারলেই, হেঁচকি সেরে যায়। সত্যেনের ছোট ভাই খুসি হয়ে ওর কান চেপে ধরল, নিজে নাক বন্ধ করল, আধ গেলাস জল শেষ হল। হেঁচকি থামল না।

হঠাৎ চমকে গেলে নাকি হিক্কা বন্ধ হয়ে যায়। সত্যেনের বন্ধুরা যখন তখন ঘরে ঢুকে সম্পূর্ণ মন-গড়া বীভৎস সব খবর এনে দিতে লাগল। শুনে সত্যেন আঁৎকেও উঠতে থাকল। কিন্তু হিক্কা গেল না।

শেষ পর্যন্ত ওর সাহসী মা-ও কাঁদতে বসলেন, 'আমি বরাবর জানি, যে-হেঁচকি থামে না, সে-ই মানুষের শেষ হেঁচকি।'

BanglaBook.org

এমন সময় তিন-তলা থেকে ওদের ৮৫ বছরের বাড়িওয়ালা নেমে এসে বললেন, 'শুনলাম হেঁচকি থামছে না, বলেন তো একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।' ভদ্রলোক বহুকাল অবসর-নেওয়া সিভিল সার্জেন। এক সময় খুব নাম-ডাক ছিল।

সত্যেনের মা হাতে চাঁদ পেলেন। 'যেমন করে পারেন হেঁচকি বন্ধ করে দিন, ডাক্তারবাবু। নইলে ও বাঁচবে না। কি ওষুধ লাগবে বলুন, আনিয়ে দিচ্ছি।'

ডাক্তার বললেন, 'বেশি কিছু লাগবে না। শুধু একটি ছোট পরিষ্কার তোয়ালে। তার আগে হাত ধোব।'

হাত ধুয়ে তোয়ালে নিয়ে, ডাক্তার সত্যেনকে বললেন, 'দেখি, বড় একটা হাঁ কর তো, বাবা। থাক্, থাক্, উঠতে হবে না।'

সত্যেন শুয়ে-শুয়েই হাঁ করল। সঙ্গে সঙ্গে হাতে তোয়ালেটা জড়িয়ে, টপ্ করে ওর জিব ধরে, ডাক্তার ওকে টেনে বসিয়ে দিলেন! ওর মনে হল শেকড়-বাকল সুদ্ধ জিব বুঝি উপড়ে এল! ব্যথার চোটে উঁ-উঁ করতে করতেই টের পেল যে হেঁচকি একেবারে সেরে গেছে!!

আরেকবার হাত ধুতে ধুতে খুসি হয়ে ডাক্তার বললেন, 'ষাট বছর আগে, লণ্ডনের গাইজ্ হস্পিটেলে আমার মাস্টারমশাই এই নিয়মটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এতকাল পরে পরখ করে দেখবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল! আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ!'

লেখকদের খোশ-গল্প

১৯৩১ সালের শান্তিনিকেতনের কথা। সন্ধ্যাবেলায় উত্তরায়ণে অনেকে আসতেন আর নানা রকম গল্প হত। যেদিন রবীন্দ্রনাথ-ও সেই সব গল্পে যোগ দিতেন সেদিন তো কথাই নেই। ঐ সময় অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ ঐ ঘটনাটা বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুর খুব বন্ধুত্ব ছিল, এ-কথা অনেকেই জানেন। তখন দুজনেরি বয়স হয়েছে, দুজনেই কিঞ্চিৎ ভুলো হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁরি মধ্যে এক দিন তাঁর বৌমা প্রতিমা দেবীকে বললেন, 'কাল দুপুরে আমার জন্য রান্না কর না। জগদীশের ওখানে আমার নেমন্তন্ন।'

পরদিন যথাসময়ে সেজেগুজে কাকে যেন সঙ্গে নিয়ে তিনি জগদীশ বসুর

boiRboi.net

বাড়ি গেলেন। বলা বাহুল্য তাঁকে দেখেই বাড়িসুদ্ধ সবাই আহ্লাদে আটখানা। বসবার ঘরে বসে নানা রকম খোস গল্প হল। কিন্তু খাবার সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও, কেউ খাবার কথা উত্থাপন করল না। তখন কবির সন্দেহ হল জগদীশ বোধ হয় নেমন্তন্নর কথা ভুলে গেছেন। বাড়ির কাউকেও যে কিছু বলেননি তাও বুঝতে অসুবিধা হল না।

অগত্যা রবীন্দ্রনাথ উঠে পড়লেন। জগদীশ বসুও সস্ত্রীক সিঁড়ি অবধি বিদায় দিতে এলেন। কয়েক ধাপ নামলেন-ও রবীন্দ্রনাথ। এমন সময় হঠাৎ জগদীশ বসুর একটা কথা মনে পড়ল। তিনি ব্যস্তভাবে রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ও হ্যাঁ, ভালো কথা, কাল দুপুরে তুমি এখানে খাবে, মনে আছে তো? এতক্ষণ আমার মনেই ছিল না।'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'ঐ দেখ, আমারো কি ভুলো মন! আসল কথাটাই বলা হয়নি। কাল একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে, আসতে পারব না, সেই কথা বলতেই আজ আসা।'

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সঙ্গীকে বললেন, 'দেখলে তো কেমন কাটিয়ে দিলাম। বেচারি ভুলে গেছে।'

সঙ্গী কোনো মন্তব্য করেননি, যদিও ভুলটা যে কোন পক্ষের সে বিষয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে গেছিল।

আসলে লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, এঁদের ব্যাপারই আলাদা। আর সাংবাদিকদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। একবার আমাদের প্রিয় বন্ধু পরিমল গোস্বামী যুগান্তরের পূজা সংখ্যার জন্য অনেক দিন আগে থাকতেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে একটা ভালো কবিতা বা গদ্য রচনা চেয়ে রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য মহালয়া যখন ভয়াবহ রকমের নিকটবর্তী, তখনো লেখাটি আদায় হল না। পরিমল গোস্বামী মরিয়া হয়ে উঠেছেন, এমন সময় এক বন্ধুর বাড়িতে প্রেমেনবাবুর সঙ্গে দেখা।

অমনি বারেন্দ্র বুদ্ধি খুলে গেল। পরিমল গোস্বামী কোত্থেকে একটা খুদে হস্তাক্ষর-সংগ্রহের খাতা বের করে বললেন, 'ওহে প্রেমেন, এই খাতার মালিক আমার নাতনি হয়। তুমি চার-পাঁচ লাইন লিখে না দিলে তার কাছে আমার মুখ দেখানো দায় হবে। সে-ও নাওয়া-খাওয়া ছাড়বে।'

কোনো ছোট ছেলে-মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে এ চিন্তাও প্রেমেনবাবুর কাছে অসহ্য। সঙ্গে সঙ্গে খাতাটায় খচ্‌খচ্‌ করে যা মনে এল চার-পাঁচ লাইন লিখে দিলেন। পরিমল গোস্বামীও খাতাটি বগল-দাবাই করে বললেন, 'তাহলে এবার আমার কথা শোন। যদি পরশুর মধ্যে তোমার ভালো লেখাটি না পাই, তাহলে যুগান্তরের পূজা সংখ্যায় এই লেখাটাই ছেপে দেব।'

বলা বাহুল্য পরশু না হলেও, তিন-চার দিনের মধ্যেই সেই ভালো লেখাটি যথাস্থানে পৌঁছে গেল।

boiRboi.net

আরো শুনুন লেখকদের গল্প। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নিজের মুখে শুনেছি। একদিন তিনি তাঁর কালিঘাটের বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন, এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে বাড়ির সামনে থামল। তার মধ্যে থেকে একজন অবাঙালী ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর মাথায় বিশাল বাণ্ডিল নিয়ে চাকর-প্যাটার্নের লোক নামল।

বারান্দায় উঠেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ?' তার পরেই সস্ত্রীক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। শৈলজানন্দ শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে টেনে তুললেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'না, না বাধা দেবেন না। আপনারি দয়ায় আমি আমাদের রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন হয়েছি। আপনার লেখা প্রত্যেকটি বই আমি অনুবাদ করে, ভগবানের ইচ্ছায় প্রচুর টাকা আর খ্যাতি পেয়েছি। তাই আপনাকে আমার ভক্তি আর কৃতজ্ঞতা না জানালে আমার মহা পাপ হবে। তবে ইয়ে—কি—বলে সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছে। আপনার অনুমতি নেবার কথা আমার একেবারেই মনে ছিল না। তার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এইগুলি গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করবেন।'

এই বলে সঙ্গের লোকটিকে ইঙ্গিত করতেই সে সেই বিশাল বাণ্ডিলটা শৈলজানন্দের পায়ের কাছে রাখল। শৈলজানন্দ একটু খুসি না হয়ে পারলেন না।

না। তাতে শাড়ি, ধুতি, চাদর, ভালো ভালো লাড্ডু বা প্যাঁড়া কিছুই ছিল না। ছিল শুধু দুর্বোধ এক ভাষায় লেখা রাশি রাশি বই, শৈলজানন্দের যাবতীয় সাহিত্য-কীর্তির অনুবাদ!

অরেকটি অতি আধুনিক গল্প না বলে পারছি না। কিছুদিন আগে আমাদের বন্ধু নন্দগোপাল সেনগুপ্তের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলাম, 'কি মুশ্‌কিল দেখুন তো, আমাদের পত্রিকাটির মহালয়ার আগেই বেরুবার কথা। গোড়ায় প্রেমেনবাবুর কবিতা যাবে। তা কাকস্য পরিবেদনা!'

নন্দগোপাল বললেন, 'কি আর এমন মুশ্‌কিল? নিজে চার-ছয় লাইন কবিতা লিখে, ওঁর নাম দিয়ে ছেপে দিন না!'

এর ওপর কোনো মন্তব্য অবান্তর হবে।

ছেলে মানুষ কর

দুনিয়াতে যত রকম শক্ত কাজ আছে, তার মধ্যে ছেলেপুলে মানুষ করা হল সব চাইতে বড়। তা সে পিটিয়ে সিধে করাই যাক, কিম্বা আহ্লাদ দিয়ে মাথায় তোলাই যাক। অনেক কাল আগে একটা বেশ মজার গল্প শুনেছিলাম। সুমতিদিদি ছিলেন একজন নাম-করা শিক্ষা-বিৎ। তিনি গেছিলেন ইয়োরোপে আরো উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল ছোট ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তোলা। বলা বাহুল্য সুমতিদি চিরকুমারী।

সে দেশে একদিন ট্রেনের কামরায় আমার কামিনীদির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। কামিনীদি-ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন এবং আরেকজন শিক্ষা-বিৎ। তাঁর সঙ্গে তাঁর ৪-৫ বছরের ছেলে। ছেলেটা সুমতিদিকে খালি খালি চিমটি কাটতে লাগল। সুমতিদি কামিনীদিদিকে বললেন, 'আপনার ছেলেকে সামলান। আমাকে খালি খালি চিমটি কাটছে। ভারি দুষ্টু হয়েছে তো!'

কামিনীদিদি আহত হয়ে বললেন, 'ছিঃ অমন কড়া কথা বললে ওর কচি মনে দাগা লাগবে। সারা জীবন ও তার চিহ্ন বয়ে বেড়াবে।'

সুমতিদি বললেন, 'তাহলে যেমন করে পারেন চিমটি কাটা বন্ধ করুন। আমার কচি মন নেই, তাতে দাগাও পড়ছে না। কিন্তু আধ-বুড়ো গায়ে কালসিটে পড়ছে।'

কামিনীদিদি ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'দেখছ বাবা, মাসিমার গায়ে কালসিটে পড়ে যাচ্ছে। ওঁকে চিমটি কাটছ কেন?'

ছেলে বলল, 'আমার ইচ্ছে করছে, তাই।'

boiRboi.net

'খুব বেশি ইচ্ছে করছে কি?'

'হ্যাঁ, খুব বেশি ইচ্ছে করছে।'

তখন কামিনীদিদি সুমতিদিকে বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন, শিশুর প্রবল ইচ্ছায় কখনো বাধা দিতে নেই। তা হলে বড় হলে ওর মধ্যে নানা রকম মানসিক বিকার দেখা যাবে। আচ্ছা, বাবা, খুব আস্তে আস্তে চিমটি কেটো, কেমন?'

সুমতিদি সিধে হয়ে উঠে বসে বললেন, 'দেখুন, শুধু ওর নয়, আমারো প্রবল ইচ্ছাতে বাধা দিলে এখনি মানসিক বিকার দেখা দেবে। ফের যদি ও আমাকে চিমটি কাটে, আমিও ওকে এইসা এক রাম-চিমটি দেব যে ও নিজের নাম ভুলে যাবে!'

সঙ্গে সঙ্গে কামিনীদিদি ছেলেকে ডেকে বললেন, 'ও কি হচ্ছে? এক্ষুনি আমার কাছে এসে বস বলছি।' ব্যাপার দেখে ছেলেও সুড়-সুড় করে মায়ের পাশে গিয়ে বসল। বাকি পথটা শান্তিতে কাটল।

শুনলাম কলকাতায় একটা ক্লাব আছে, তার সদস্যরা কখনো নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ধমক-ধামক মার-ধোর করেন না। ও-সব করলে নাকি শিশুর চিত্তের স্বাভাবিক কোমলতা একেবারে উপে যায়। তবে অন্যদের ত্যাঁদড় ছেলেমেয়েদের তাঁরা বকেন কিম্বা ঠ্যাঙান কি না বলতে পারি না। একবার ঐ ক্লাবের এক সদস্যর ছেলের জন্ম-দিনে খেলনা কেনা হবে। ছেলে মা-বাবাকে বলল, 'তোমরা ভালো খেলনা চেন না। আমি নিজে পছন্দ করে কিনব।'

ক্লাবের সভাপতি খুসি হয়ে বললেন, 'ভালোই তো। আমার এক বন্ধুর খেলনার দোকান আছে। সেখানে সুবিধা দরে ভালো জিনিস পাওয়া যাবে।' তাই ঠিক হল। সভাপতির সঙ্গে ছেলে, তার মা আর বাবা গেলেন সেই দোকানে। অত খেলনা দেখে ছেলের মুন্ডু ঘুরে গেল। একবার বলে, 'এটা নেব!' তার পরেই বলে, 'না, ওটা নেব!' শেষে একটা মস্ত কাঠের দোলনা-ঘোড়ায় চেপে আর নামতে চায় না!

খালি বলে, 'এইটে কিনব!' এদিকে ঘোড়ার দাম প্রায় দু-শো টাকা, ছেলের মা-বাবার সাধ্যের বাইরে। তাকে ভোলাবার বহু চেষ্টা হল। এটা দেখানো হল, সেটা দেখানো হল, ঘোড়ার নিন্দে করা হল। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। ঐ ঘোড়া ছাড়া সে কিচ্ছু নেবে না!

শেষটা চ্যাঁচামেচি, কান্নাকাটি। ছেলে ঘোড়া থেকে নামবেও না, বাড়িও যাবে না। মা-বাবা হয়রান হলেন। দোকানদার ভদ্রলোকও তাজ্জব বনে গেলেন। দোকান-ঘরে ছোটখাটো একটা খন্ড-প্রলয় শুরু হয়ে গেল। অন্য খদ্দেররা হাঁ!

বন্ধুর অবস্থা দেখে, ক্লাবের সভাপতি শেষ পর্যন্ত ছেলের মা-বাবাকে বললেন, 'তোমরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ছেলেকে রাজি করিয়ে নিয়ে আসছি।'

মা-বাবা বাইরে গেলেন। সভাপতি ছেলের কানে-কানে গুটি-কতক কথা বলবামাত্র ছেলে ঘোড়ার পিঠ থেকে তড়াক্ করে নেমে পড়ে, বাইরে গিয়ে মা-বাবার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'এক্ষুনি বাড়ি চল!' মা-বাবা তো অবাক! 'কিন্তু খেলনা কেনা

boiRboi.net

হল না যে?' 'বাপি কাল কিনে দেবে। বাড়ি চল।'

তারা বিদায় হলে, দোকানদার সভাপতিকে বলল, 'এ কি ম্যাজিক্ দেখলাম? কি বললে ওর কানে কানে?'

সভাপতি কাষ্ঠ হাসলেন, 'বললাম—ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া! এই মিনিটে যদি নেমে মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি না যাস্ তো প্যাঁদানি দিয়ে আলু-ভাতে বানিয়ে দেব!—আচ্ছা, আসি, ভাই।'

আরেকটা সত্যি ঘটনা শুনুন। এক ইতিহাসের ছাত্র গবেষণা করছিল। অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে তাকে অনেক কাজ করতে হত। অধ্যাপক আর তাঁর স্ত্রী দেবতুল্য মানুষ, কিন্তু তাঁদের ছেলেটি পাজির পা-ঝাড়া! চ্যাঁচামেচি, কাজে ব্যাঘাত তো করতই, তার

BanglaBook.net

ওপর একটা শক্ত কাঠের বল্ দিয়ে হতভাগ্য ছাত্রের মাথায় পিটত। কিন্তু কিছু বলার উপায় ছিল না, কারণ ছেলের মা-বাবা সারাক্ষণ ধমক-ধামক মার-পিটের কুফল সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিতেন।

চুপ করে সব সয়ে যেত ছাত্র। তারপর গবেষণা শেষ হল ; থীসিস্ গৃহীত হল ; ছাত্র ডক্টরেট পেল। তখন এক শুভদিনে এক হাঁড়ি রাজভোগ নিয়ে গুরুকে আর গুরুপত্নীকে প্রণাম করে, বেরিয়ে যাবার সময় ছেলেকে বলল, 'আমার সঙ্গে একটু বাইরে এসো তো দেখি।' ছেলে ভাবল নিশ্চয় ভালোমন্দ কিছু পাওয়া যাবে। বাইরে এসেই তার গালে একটা বিরাশী সিক্কার চড় কষিয়ে ছাত্র বলল, 'যা, মা-বাবাকে বল্‌গে যা!' এই বলে বাড়ি চলে গেল।

পটোদিদি

পটোদিদিকে শেষ বয়সে দেখেছি শামলা রং, মোটা শরীর, কথা বলার বিরাম নেই। কিন্তু ঐ কাটা-কাটা নাক-মুখ আর ঈগল-পাখির চাহনি নিয়ে এক কালে যে সুন্দরী ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভারি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মানুষটি। বিয়ের সময় বাপ যে-সব টাকাকড়ি, বাড়ি ঘর দিয়েছিলেন, সে সমস্তই কোন কালে একে ওকে ইত্যাদিকে বিলিয়ে, কিচ্ছু না দিয়েই জীবনের শেষ কটা বছর দিব্য কাটিয়ে দিলেন।

নিজের আনাড়ি হাতে জোড়াতালি দেওয়া জামা আর সরু পাড়ের মিলের মোটা কাপড় পরনে ; পায়ে সবুজ ক্যাম্বিসের জুতো, ভাইপোর বাড়ির দরজা-জানলায় সবুজ রং হবার সময় টিনে যেটুকু তলানি পড়েছিল, তাই দিয়ে স্বহস্তে রঞ্জিত।

আমাকে বললেন, 'কেন, সবুজ কি খারাপ রং, তাহলে আর গাছ-পালা সবুজ হত না। তাছাড়া কত সুবিধা ভেবে দ্যাখ্, মরলা হলেও টের পাবার জো নেই। অথচ এক পয়সা খরচ নেই।—আচ্ছা ঐ মন্দির-প্যাটার্নের বড় বাড়িগুলোকে আলাদা টুকরিতে ভরে লগেজ্ বাড়াচ্ছিস্ কেন?'

মধুপুরের পাট তোলা হচ্ছিল। আমি কর্মী, পটোদিদি উৎসাহী দর্শক। বলতে ভুলে গেছি যে তিনি আমার মায়ের বয়সী ননদিনী।

আমি বললাম, 'তা না হলে কি ভাবে নেব? ভেঙে যাবে যে। এত কষ্ট করে

তৈরি করা।'

পটোদিদি বললেন, 'তাতে কি হয়েছে? বিছানার ভেতর প্যাক্ করে নিবি। কষ্ট করে করা হলেও, জাপানী চীনেমাটির চায়ের সেটের চেয়ে তো আর দামী নয়। জানিস্, আমার মেয়ে টেপু ওর জাপানী চায়ের-সেট হোল্ড-অলে ভরে কলকাতা থেকে দিল্লী নিয়ে গেছিল!'

শুনে আমি এমনি প্রভাবিত হয়ে পড়লাম যে বড়ি প্যাক্ করা বন্ধ করে, বললাম, 'তাপ্পর কি হল?'

পটোদিদি উঠে পড়লেন, 'কি আবার হবে? সব ভেঙে গেছিল নিশ্চয়!'

এই রকম ছিলেন আমার পটোদিদি। তিনি কিন্তু আমার মন-গড়া গল্পের বইয়ের চরিত্র নন, সত্যিকার মানুষ। ভারতের প্রথম মহিলা অঙ্কে গ্র্যাজুয়েট। নাম ছিল

স্নেহলতা মৈত্র। হয়তো ১৮৮৩ সালে জন্মেছিলেন। সাংসারিক দিক থেকে খুব একটা সুখী ছিলেন না। তবে দুঃখ-টুঃখ তাঁর গায়ে আঁচড় কাটতে পারত না। সম্পূর্ণ নিজের হাতে তৈরি এক অদৃশ্য জগতে বাস করতেন।

বগলে একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা পুঁটলি থাকত আর একটা তালি-মারা কালো পুরুষদের ছাতা। বলতেন ঐ পুঁটলিতে যা আছে তাই দিয়ে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো যায়। ঐহিক এবং পারত্রিক। দুটো লেবু, গুটি চারেক মিয়ে যাওয়া বিস্কুট, একটা রুদ্রাক্ষের মালা, পরমহংসদেবের ছোট্ট একটা ছবি। ব্যস্ আর কি চাই! পরমহংসদেব নাকি ছোটবেলায় ওঁকে কোলে করেছিলেন, তাই আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর এতটুকু অনিষ্ট করতে পারেনি।

boiRboi.net

পাঁচ ভূতে যে তাঁর বাপের দেওয়া যথাসর্বস্ব খসিয়ে নিয়েছে, তাকে তো আর সত্যিকার ক্ষতি বলা যায় না। একবার একটা স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় পুটলি বগলে পটোদিদিকে দেখেছি, সেকালে লাট-মেম লেডি উইলিংডনের সঙ্গে বিশুদ্ধ ইংরিজিতে গল্প করছেন। মেম আহ্লাদে আটখানা। না জানি কি রসের গল্পই বলেছিলেন পটোদিদি।

মাথাখানা অঙ্কে ঠাসা ছিল। বাস্তবিক এমনি অঙ্কের মাথা আমি আর কোনো মেয়ের দেখিনি, যদিও আমি নিজে অঙ্কে একশোতে একশো পেতাম। পঞ্চাশ বছর আগে যা যা শিখেছিলেন তার এক বর্ণ ভোলেননি, না অঙ্ক, না সংস্কৃত। চর্চার অভাব তাঁর কিচ্ছু করতে পারত না। একটা টুল টেনে নিয়ে অমনি বি-এ ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের অঙ্ক বোঝাতে বসে গেছেন। অমনি যত রাজ্যের জটিল সমস্যা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যেত।

আর শুধু অঙ্কের কেন? সক্কলের সব সমস্যা মেটাবার আশ্চর্য সব উপায় ঠাওরাতে পারতেন। একদিন বললেন, 'ধোপার বাড়ির কাপড়ের সঙ্গে বাড়িতে ছারপোকা এসেছে তো কি হয়েছে? ছারপোকার জায়গায় একটু ঝোলা-গুড় মাখা। তারপর শিশিতে ভরে কিছু লাল পিঁপড়ে এনে ছেড়ে দে। সব ছারপোকা খেয়ে তো শেষ করবেই, তোদেরো কামড়াবে!'

আমরা শিউরে উঠলাম। 'কি সব্বনাশ! তারপর লাল পিঁপড়ে যাবে কিসে?' পটোদিদি তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'তারও নিশ্চয় সহজ উপায় আছে, খোঁজ করে দ্যাখ্।'

আরেক দিন বললেন, 'মধুপুরের এই গরমে ছাদ গরম হবে না তো কি হবে? তার তো সহজ ওষুধ-ই আছে। নর্দমার সব ময়লা জল ছাদে ফেলবি। ঘর কেমন ঠাণ্ডা না হয় দেখব! তা গন্ধ একটু হবেই। কিন্তু ময়লাগুলো শুকিয়ে কি চমৎকার সার হবে বল্ দিকিনি!'

সেকালে রেফ্রিজারেটর ছিল না কারো বাড়িতে; মধুপুরে সহজে বরফ-ও কিনতে পাওয়া যেত না। পটোদিদি বললেন, 'সে কি! জল ঠাণ্ডা করতেও জানিস্ না? এক কলসি জলের চারদিকে সপ্‌সপে ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে, চড়চড়ে রোদে বসিয়ে রাখ্ ঘণ্টাখানেক। বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!' বাস্তবিকই তাই। করে দেখেছি। তোয়ালেও শুকোল, জল-ও হিম।

আরেকবার বলেছিলেন, 'লংকার গন্ধ চাই, কিন্তু ঝাল হলে চলবে না? সে আর এমন কি শক্ত! রান্না হয়ে গেলে, কড়াইসুদ্ধ ঝোল নামিয়ে, ঐ টগবগে গরম ঝোলে গোটা বারো বোঁটাসুদ্ধ ঝাল কাঁচা লংকা ছেড়ে, ঢাকা দিয়ে দিবি। ৫ মিনিট বাদে লংকাগুলো তুলে ফেলে, তরকারি ঢেকে রাখিস্। সুগন্ধে ভুরভুর করবে।' এ-ও করে দেখেছি, অব্যর্থ।

একদিন পটোদিদি হঠাৎ বললেন, 'দ্যাখ্, একবার আমার মাথাটার কি যেন হল।

খালি মনে হতে লাগল আমি আমি নই। আমি আমার ছোট বোন বুড়ু। এ তো মহা গেরো! বুড়ুই যদি হলাম, তবে আমি এ-বাড়িতে কেন? আমার তো বুড়ুর বাড়িতে চলে যাওয়া উচিত। আচ্ছা, আমি সত্যি বুড়ু তো? আয়নার কাছে গিয়ে দেখতাম, হ্যাঁ, এ যে বুড়ু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ তো বুড়ুর নাক-মাথা পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু হুট্ করে তার বাড়িতে গিয়ে না উঠে, একবার পরখ করে দেখাই ভালো, আমি আমি, না আমি বুড়ু।

সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগনোমেট্রির বইখানা নামিয়ে খুব খটমট দেখে একটা বুদ্ধির অঙ্ক কষে ফেললাম। তারপর যেই না পাতা উল্টে দেখলাম এক্কেবারে ঠিক হয়েছে, কোথাও এতটুকু খুঁৎ নেই, তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। নাঃ, ও অঙ্ক কষা বুড়ুর কম্ম নয়। তাহলে আমি নিশ্চয় আমিই!'

এই রকম ছিলেন আমার পটোদিদি। ১৯৬০ সালে স্বর্গে গিয়ে কি করছেন কে জানে।

গিরীশদা

ঐ যে রাঁচীর ট্রেনের গল্পে আমার সুন্দরী মেজদিদির কথা বলেছিলাম, উনি আসলে পটোদিদির বড় বোন, আমার ননদ। ওঁর স্বামী গিরীশ শর্মাকে চিনত না, সেকালে কলকাতায় এমন লোক কম ছিল। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি দোহারা মানুষটি ছিলেন, থুতনিতে চাপদাড়ি। সাজগোজের বালাই ছিল না, খাটো ধুতি, বাড়িতে ফতুয়া, বেরুতে হলে গলা-বন্ধ কোট।

কারো ধার ধারতেন না, নিজের একটা ছোটখাটো ওষুধপত্রের ব্যবসা ছিল। বড়লোক আত্মীয়স্বজনের খোশামোদও করতেন না, অথচ সদ্ভাব-ও রাখতেন। বেজায় রসিক মানুষটি, অযোগ্যদের ভালোবাসবার অদ্ভুত ক্ষমতা আর সব চাইতে বড় কথা হল, কারো মত নিয়ে চলতেন না। উগ্র এক রকম স্বকীয়তা ছিল। না, ভুল বললাম। শুনেছি ওঁর মধ্যে উগ্র কিছু ছিল না, বরং বলা যায় উদ্ভট এক রকম এক-গুঁয়েমি ছিল।

হ্যারিসন রোড পাড়ার একটা গলিতে গোটা দুই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

বয়স কম, অবস্থা খুব সাধারণ। গলির ও-পারে, বাড়ির মুখোমুখি আরেকটা ছোট বাড়িতে যোগীন্দ্রনাথ সরকার থাকতেন। তখন তাঁরো বয়স কম, অবস্থা সাধারণ, শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন নাম-ডাক হয়নি।

দুজনায় বেজায় ভাব। বাড়ি দুটিকে যদ্দুর মনে হয় মুখোমুখি না বলে পেছো-পিছি বললে ঠিক হত। অর্থাৎ কি না গলিতে সামনা-সামনি দুই রান্নাঘর। কার বাড়িতে কি চড়েছে, অন্য বাড়ি থেকে সঙ্গে সঙ্গে জানা যেত। আর শুধু রান্নাঘর-ই বা কেন, এক বাড়ির কোনো কিছুই অন্য বাড়ির অজানা বা অদৃষ্ট থাকত না।

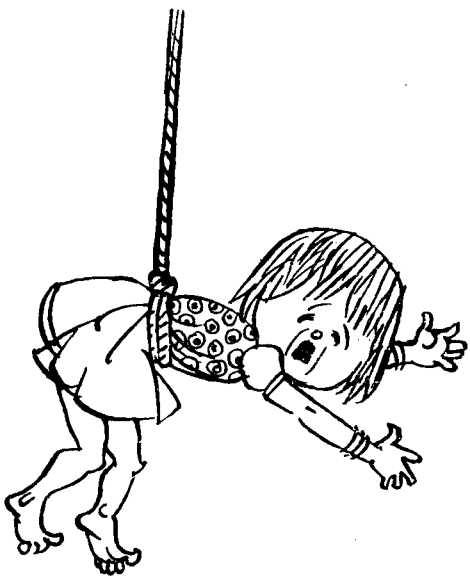

একদিন বিকেলে যোগীন সরকার বাড়ি ফিরছেন। গলিতে ঢুকেই এক অভূত-পূর্ব দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন। গিরীশ শর্মার বড় মেয়ে শান্তির কোমরে দড়ি বেঁধে দোতলার জানলা থেকে ফুটপাথে নামানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য নামাচ্ছেন গিরীশ শর্মা। বিকট চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মেয়ে নিরাপদে ফুটপাথে পেঁছলে পর, যোগীন সরকারের মুখে ভাষা ফিরে এল। রেগেমেগে বললেন, 'এ-সব কি হচ্ছেটা কি? তোমার বাড়াবাড়ির দেখছি সীমা-পরিসীমা নেই।'

গিরীশ অম্লানবদনে বললেন, 'ভয় ভাঙাচ্ছি। আমাকে বাধা দিও না। পরে মধুপুরের বাড়ির কুয়োয় নামাব।' সুখের বিষয়, আত্মীয়-স্বজনের জ্বালায় সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

BOIRboi.net

উপস্থিত-বুদ্ধির জন্য বেশ নাম-ডাক ছিল তাঁর। একবার দোতলা থেকে রাস্তায় থুতু ফেলেছিলেন। পড়েছিল নিরীহ এক পথচারীর মাথায়। সে রেগেমেগে ওপরে তাকিয়ে, দাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে দেখে বলল, 'কি বিশ্রী ব্যাপার দেখুন দিকি। থুতু ফেলবেন, তা একটু দেখে ফেলতে পারেন না?'

গিরীশ শর্মা চটপট উত্তর দিলেন, 'দেখে না ফেললে কি কখনো মাথার ঠিক মধ্যিখানে পড়ে?'

খেতে ভালোবাসতেন দুই বন্ধু, খাওয়াতেও। একবার যোগীন সরকার এক সের মাংস কিনেছিলেন। দুই বাড়িতেই গিন্নিরা রাঁধতেন। যোগীন সরকারের স্ত্রী মাংস কুটে, ধুয়ে, নুন-হলুদ মাখিয়ে, ঢাকা দিয়ে একটু ভেতরের দিকে গেছেন। গিরীশ শর্মা সেই সুযোগে হাঁড়িসুদ্ধ কাঁচা মাংস তুলে এনে, গিন্নিকে বললেন, 'এটা খুব ভালো করে রাঁধো তো দেখি।'

মেজদিদি চমৎকার রাঁধতেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে খুব ভালো করে মাংস রেঁধে, উনুনের পাশে ঢেকে রেখে, চান করতে গেলেন। অমনি যোগীন সরকার রান্না মাংসটি বাড়ি নিয়ে গেলেন। এর একটু বাদেই তাঁর বড় ছেলে গিরীশ শর্মাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল, 'তোমরা বাড়িসুদ্ধ সকলে আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে খাবে। শুনলাম দুষ্কৃতকারীরা তোমাদের রান্নাঘরে হামলা দিয়েছে।' তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ।

ক্রমে দু-বাড়ির ছেলেমেয়েরা বড় হল। যোগীন সরকাররা তখনো ঐ বাড়িতেই থাকতেন কি না জানি না, তবে কাছাকাছিই থাকতেন। তাঁদের বাড়িতে কোনো ভাইঝি-টাইঝির বিয়ে। এ বাড়িতে বিয়ে মানেই গিরীশ শর্মার বাড়িতেও বিয়ে। দুজনে হরিহরাত্মা।

উদয়াস্ত খাটতে লাগলেন গিরীশ। উনুন কাটানো, ঠাকুর বহাল করা, ছানাপটি থেকে ছানা কেনা, ভিয়েন বসানো, ম্যারাপ বাঁধা, সওদা করা—এ-সব কাজ গিরীশ ছাড়া কে করবে? সেই হট্টগোলের মধ্যে গিরীশের বাড়ি গিয়ে যে তাঁদের নেমন্তন্ন করে আসা হয়নি, সেটা কেউই খেয়াল করেনি।

তাঁদের খেয়াল না থাকলেও, গিরীশের যথেষ্ট ছিল। ভোজের মেনু তাঁরি করা, কাজেই নিজের বাড়িতে অনিচ্ছুক গিন্নিকে দিয়ে সেই-সমস্ত পদ রাঁধাতে কোনো অসুবিধা ছিল না। তারপর বিয়ে-বাড়ির লোক খাওয়ানো তদারক করার এক ফাঁকে বাড়ি গিয়ে, খাবারগুলো টিপিন-ক্যারিয়ারে ভরে, শান্তির হাতে দিয়ে, নিজের বগলে কুশাসন আর হাতে মাটির গেলাস নিয়ে, যেখানে শেষ ব্যাচের পাত পড়ছিল, তারি এক ধারে আসন দুটি পেতে দুজনে বসে পড়ে, দুটি কলাপাতা চাইলেন।

কিছুক্ষণ তাঁর দেখা না পেয়ে সবাই ভাবছিল কোথায় গেলেন। পরিবেষ্টারা ছুটে আসতেই গিরীশ শর্মা বললেন, 'উঁহুঁহুঁ! আমাদের খাবার আমরা এনেছি। আমরা তো আর নিমন্ত্রিত নই!'

সঙ্গে সঙ্গে হুলুস্থুল কান্ড। যোগীন সরকারের বড় বৌদি টিপিন ক্যারিয়ার কেড়ে নিলেন। তারপর গিরীশের বাড়িতে নিজে গিয়ে সবাইকে ধরে নিয়ে এসে, পরিবেশন করে খাওয়ালেন।

এত রসই বা এখন কোথায়, এমন বন্ধুই বা কে পাচ্ছে?

খাওয়া-দাওয়া

পৃথিবীতে যত রকম আনন্দের ব্যাপার আছে, তার মধ্যে জনপ্রিয়তা আর পরিতৃপ্তির দিক থেকে খাওয়ার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না। অন্য আনন্দগুলোকে ছাড়তে হলে, হাজার কষ্ট হোক, তবু প্রাণে বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু খাওয়া ছাড়লেই অক্কা। তাছাড়া নিজে খেতে যত না আনন্দ, পরকে খাওয়ানোতে তার চাইতেও বেশি আনন্দ। ভোগে জগতে খাওয়ার মতো জিনিস নেই। আর খাওয়া নিয়ে যেমন সব সরস গল্প শোনা যায় তেমন আর কিছু নিয়ে নয়।

আমার বাবা জরিপের কাজে বর্মার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছিলেন। সেই সময় ঘোর বনের ধারে এক কাঠ-গুদামের মালিকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। লোকটি পশ্চিমা বামুন, তার রাঁধবার লোকটিও পশ্চিমা বামুন। মালিক বাবাকে এক দিন রাতে খেতে বললেন।

বাবা মহা খুশি। ডাল আর শুকনো আলু আর নিজের হাতে মারা হরিণের মাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছিল। ভেবেছিলেন নিশ্চয় পুরী আর ভালো ভালো ভাজি আর ক্ষীরের মিষ্টি খাওয়া যাবে। গিয়ে দেখলেন সে-গুড়ে বালি। মস্ত মস্ত দুটো বন-মোরগ রোস্ট হচ্ছে। চারদিক সুগন্ধে ম-ম করছে। বলা বাহুল্য পুরী ভাজি না পেলেও সেদিনের খাওয়াটা মন্দ হয়নি।

খাওয়ার পর মুখে আমলকির চুর ফেলে বাবা বললেন, 'খুব ভালো খেলাম। তবে আমি অন্য রকম আশা করেছিলাম।'

লোকটি হাসলেন, 'বামনাই খাবার বুঝি? তবে শুনুন আমার কাহিনী। আমরা বংশানুক্রমে ঘোর নিরামিষাশী। এখানে এসে বন্ধুবান্ধবের দলে পড়ে মাছ-মাংস খেতে শিখলাম। কেউ গিয়ে অমনি বাবার কানে কথাটা তুলে দিল। বাবাও পত্রপাঠ আমাদের পৈত্রিক বামুনঠাকুরের ছেলেকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন।

BanglaBook.org

সে নিজে তো মাছ-মাংস ছোঁবেই না, আমি স্টোভে নিজের মতো রে'ধে খেলেও নাক সি'টকোবে, নানা রকম আপত্তিকর মন্তব্য করবে। ক-দিন আর সহ্য করা যায় বলুন ?

শেষটা এক দিন দুটো মোটাসোটা মুরগি নিয়ে ওর রান্নাঘরে ঢুকলাম। ও হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল। আমি বললাম, 'এ দুটোকে কাট্।' ও বলল, 'প্রাণ থাকতে নয়।'

আমি তখন পায়ের চটি খুলে ওকে আগাপাশতলা পেটালাম। ও বলল, 'কাটছি! কাটছি!'

কাটা হয়ে গেলে বললাম, 'এবার রাঁধ্।' ও বলল, 'কিছুতেই না।' আমি চটি খুলতেই ও বলল, 'রাঁধছি! রাঁধছি!' রান্না হলে, দু-ভাগ করে বললাম, 'অর্ধেকটা তুই খা!' ও বলল, 'মেরে ফেললেও না।' আমি তখন আবার চটি খুললাম। ও-ও সঙ্গে সঙ্গে থালা টেনে নিয়ে খেতে বসে গেল।

পর দিন কিছু বললাম না। ভাবলাম একটু একটু করে সইয়ে নিতে হবে। কিন্তু সেদিন ব্যাটা নিজের থেকেই মুরগি কিনে এনে, কেটেকুটে, রেঁধে-বেড়ে, দু-ভাগ করে, বড় ভাগটি নিজের জন্য তাকে তুলে রেখে দিল। সেই ইস্তক খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আর কোনো অসুবিধা হয়নি।

এই তো গেল সুখীদের গল্প। আমার বন্ধু মীরা দত্ত গুপ্তর জ্যাঠামশাই ছিলেন বাবার বন্ধু। সেই করুণা জ্যাঠার কাছে একটা চমৎকার গল্প শুনেছিলাম। উনি ছিলেন নামকরা এঞ্জিনীয়ার। একবার কোনো কাজে চাঁদপুরের ওদিকে যেতে হয়েছিল। কাজ সেরে ফেরবার পথে, বড় জাহাজে উঠে শুনলেন, তখনো ছাড়তে ঘণ্টা দুই দেরি আছে।

ওপরের ডেকে দাঁড়িয়ে জ্যাঠামশাই চারদিকের মনোরম দৃশ্যপট দেখতে লাগলেন। হঠাৎ চোখ পড়ল জাহাজের পাশে বাঁধা একটা ছোট মাছ-ধরার নৌকোর ওপর। তার পাটাতনে তোলা উনুনে টগবগ করে ভাত ফুটছে। পাশে ছোট্ট কড়াইতে কলাপাতা চাপা দেওয়া কি যেন রয়েছে।

একটু পরেই স্নান উপাসনা সেরে, জেলে খেতে বসল। একটা কান-তোলা, চটা-ওঠা কলাই-করা থালায় এক রাশি ধোঁয়া-ওঠা ভাত ঢালল। তারপর কলা-পাতা তুলে, কড়াই কাৎ করে লাল রগ্‌রগে কিসের ঝোল ভাতের ওপর ঢেলে দিল। জ্যাঠামশাই দেখলেন প্রকাণ্ড বড় কিসের যেন ডিমের ঝোল। সাধারণ হাঁস-মুরগির অত বড় ডিম হয় না।

লোকটা ডিমটাকে কেবলি পাতের এধার থেকে ওধারে সরায় আর লাল রগ্‌রগে ঝোল দিয়ে ভাত মেখে, এই বড় বড় গরাস মুখে ফেলে আর উঃ! আঃ! করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবিয়ে গেলে। কিন্তু ডিমটাকে ভাঙে না। শেষটা যখন ঝোল দিয়ে ভাতের পাহাড় শেষ হল, তখন হাত বাড়িয়ে নদীর জলে আঁচিয়ে, ডিমটাকে ভালো করে ধুয়ে-মুছে একটা থলির মধ্যে তুলে রাখল।

এবার জ্যাঠামশাই আর কৌতূহল চাপতে না পেরে, ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি করলে, ভাইজান?' ওপর দিকে তাকিয়ে, সে বলল, 'রোজ শুধু লংকার ঝোল খেয়ে পেট ভরে না, বাবু, তাই নুড়িটে দিয়ে রাঁধি।'

একেক সময় ভাবি, ভালো খেতে, মন্দ খেতে বলে কিছু নেই ; যার যেমন অভ্যেস। পঞ্চাশ বছর আগে শান্তিনিকেতনের কাছে সাঁওতালদের গ্রামে, বিশ্বভারতীর ছেলেরা

একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় করেছিল। বেশ পড়াশুনো করত ছেলেমেয়েরা।

পুরস্কার বিতরণের দিন সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া হল। আমরা চাঁদা তুলে দিয়েছিলাম। তাই দিয়ে সিঙাড়া জিলিপি কেনা হয়েছিল। পয়সা পয়সা করে ফুলকপির সিঙাড়া, পয়সা পয়সা জিলিপি। ছেলেমেয়েরা মহা খুশি।

পরে একটা ছোট ছেলেকে বললাম, 'কি রে, জিলিপি সিঙাড়া কেমন লাগল?' সে এক গাল হেসে বলল, 'খুব ভালো। কিন্তুক্ মেঠো ইঁদুর আরো ভালো।'

পছন্দের কি আর কোনো নিয়ম-কানুন আছে? ঐ সময় দিনু ঠাকুর এক দিন আমাদের দুপুরে নেমন্তন্ন করলেন। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে শুঁটকিমাছের ঝাল চচ্চড়িও ছিল। আমরা ডাল-ফেলা, পোরে ভাজা, নারকেল চিংড়ি ইত্যাদি খেয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে শুঁটকিমাছটি বারান্দার নিচে ফেলে দিলাম। কিন্তু দিনুদাদা এক গ্রাস শুঁটকি-মাছ আলাদা করে রেখে দিলেন, পায়েস খাবার পর মুখশুদ্ধি করবেন বলে।

সেই বর্ষাতেই বাবা একবার এক মাসের ওপরে ঘোর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে, এক দিন সন্ধ্যায় একটা নদীর ধারে এসে পেঁছিলেন। সেখানে একটা বর্ধিষ্ণু গাঁ। গাঁয়ে সেদিন ঙাম্পি তোলা হচ্ছে, তার গন্ধে গ্রামে টেকা দায়। শেষটা বাবারা গ্রামের বাইরে যেদিক থেকে বাতাস আসছিল, সেইদিকে তাঁবু ফেললেন।

বাবা স্নান সেরে, তাঁবুর বাইরে, ক্যাম্প-চেয়ারে বসলেন। তাঁর চাকর শশী ঘি দিয়ে লুচি ভাজতে লাগল। এমন সময় গাঁয়ের মোড়ল এসে হাত জোড় করে বলল, 'ও সায়েব, তোমরা কি রান্না করছ, তার বিকট গন্ধে আমরা টিকতে পারছি না। দয়া করে আর কোথাও উনুন সরাও।' ততক্ষণে লুচি ভাজা হয়ে গেছিল, কাজেই বাবা তাকে আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠালেন।

নেশাখোর

boiRboi.net

আমাদের বাড়ি ছিল বড়ই গোঁড়া। মদ বা মাতাল শব্দ উচ্চারণ করলে বড়রা বিরক্ত হতেন। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে গুলিখোর গাঁজাখোর নিয়ে মজার মজার গল্প বাবা জ্যাঠামশাইরা হামেশাই বলতেন। আমাদের রান্না করত যামিনীদা, তারো বাড়ি ছিল মসুয়া-গ্রামে। সম্ভবতঃ ঠাকুমাই তাকে বাবার সংসার তদারক করবার

জন্য গাছিয়ে দিয়েছিলেন।

ঐ যামিনীদার শ্বশুরটি ছিল একজন নামকরা গাঁজাখোর। বোঝাই যাচ্ছে এ গল্প বাবার কাছ থেকে শোনা, যামিনীদার কাছ থেকে নয়। এমনিতে শ্বশুর মন্দ লোক ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকত। তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না।

একদিন রাতে রান্না করতে করতে যামিনীদার শাশুড়ি উঠে এসে বলল, 'অখনো বইয়া আছ ? বখ্‌না বাছুর তুলছ নি ?'

নেশার ঘোরে কথাটা বুড়োর কানে গেল। তাই তো, বখ্‌না বাছুর দুপুর থেকে তেঁতুল-তলায় বাঁধা আছে। তাকে তো গোয়ালে তোলা হয়নি। যদি বাঘে নেয় !!

সঙ্গে সঙ্গে তক্তাপোষে ধড়মড় করে উঠে বসল বুড়ো। ও-সব অঞ্চলে সেকালে বড়ই বাঘের উপদ্রব ছিল। এক লাফে উঠে পড়ে, দড়াম করে দরজা খুলে শ্বশুর কৃষ্ণপক্ষের রাতে বেরিয়ে পড়ল।

কানে এল তেঁতুল-তলা থেকে বাছুরের ডাক। বেচারি ভয় পেয়েছে। শ্বশুর ছুটে গেল সেদিকে। মাঝপথেই দেখে ভয়ের চোটে খুঁটি উপড়ে বাছুর নিজেই চলে

boiRboi.net

এসেছে।

বুড়ো তাকে খপ্ করে কোলে তুলে, ঘরের দিকে ফিরল। বাবা! বাছুরের কি রাগ! প্রাণপণে চার-পা ছুঁড়ে সে কি ছট্‌ফটানি। বুড়ো গায়ের জোরে তাকে বুকের কাছে জাপ্টে ধরে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ ঘর থেকে তেলের পিদিমের একটুখানি আলো বাঁকা হয়ে বাছুরের গায়ে পড়ল। বুড়ো চমকে উঠল। ই কি! বাছুরের ল্যাজে কালো ডোরা কাটা কেন? ভালো করে দেখে, শুধু ল্যাজে নয়, সারা গায়েই ডোরা কাটা! তবে কি—তবে কি! বাছুরটাকে তুলে ধরে দুম করে ছুঁড়ে ফেলে দিল শ্বশুর। সে-ও একটা গাঁউক্ শব্দ করে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল।

বুড়ো আবার তেঁতুল-তলায় ফিরে গিয়ে, বাছুরের দড়ি খুলে, তাকে কোলে নিয়ে ঘরে এনে, তক্তাপোষের পায়ার সঙ্গে বেঁধে, দরজা বন্ধ করে, থম্ হয়ে বসে রইল। আরো রাত হলে, নেশার ঘোর কমলে, বৌকে একবার বলল, 'বলে বাঘ কোলে নিছি!'

আজকাল দিন পাল্টে গেছে, মদের গল্প সবাই বলে। আমার ছোট বোন লতিকা বলেছে কয়েক বছর আগে অ্যামেরিকায় দু-জন সাংবাদিক একজন ৮৯ বছরের বুড়োর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গেছিল। বুড়োর গাছ থেকে পাকা আমটার মতো স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছিল। তীরের মতো সোজা। শহরময় চষে বেড়াতেন। বুদ্ধি টন্‌টন্ করত।

সাংবাদিকরা জানতে চাইল এই বয়স পর্যন্ত ভদ্রলোক এমন স্বাস্থ্য রাখলেন কি উপায়ে। বুড়ো বললেন, 'সেটা ঠিক বলতে পারছি না। জেনেশুনে কোনো উপায় নিইনি। তবে আমার মনে হয়, এর একমাত্র কারণ হল আমি কখনো মদটদ ছুঁই না।'

এক তলার ঘরে এইসব কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় সিঁড়িতে মহা ধুপধাপ শব্দ। কে যেন ফুর্তির চোটে গান গাইতে গাইতে হুড়মুড় করে ওপরে উঠছে। সাংবাদিকদের চাঞ্চল্য দেখে বুড়ো বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না, মশাইরা! ও আমার বাবা ছাড়া কেউ নয়। দুঃখের কথা আর কি বলব, ৮০ বছর ধরে দেখছি, সন্ধ্যের পর রোজ চুর হয়ে বাড়ি ফেরে! অথচ দেখছেন তো কুড়ি বছরের ছোকরার মতো দাপট। আমার নাতিদের সঙ্গে বেস্-বল্ খেলে!'

লতিকার কাছে একটা দিশী গল্পও শুনেছি। রামু শ্যামু মুখোমুখি বসে সমানে তাড়ি খেয়ে যাচ্ছে। অনেক রাত হয়ে গেছে। দুজনার মধ্যিখানে একটা তেলের বাতি জ্বলছে। সেই আলোতে হঠাৎ শ্যামুর মুখের দিকে তাকিয়ে, রামু বলল, 'ওরে শ্যামু, অত মদ খাস্‌নে বলছি! তোর মুখটা কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে!'

মনে হয় গুলিখোরদের মধ্যে ভারি একটা দিশী ভাব আছে। জ্যাঠামশাইদের কাছে এন্তার গুলিখোরের গল্প শুনেছি। তাদের মনে নানা রকম খেয়াল চাপে। কল্পনাশক্তি বেজায় বেড়ে যায়। একজন কড়া মেজাজের ভদ্রলোকের ছেলে, বাপের শাসন এড়িয়ে গুলিখোরদের দলে গিয়ে জুটেছিল। পাড়ার একজন লোক তার

বাপকে বলে এল, 'দেখুন গিয়ে, গুলির আড্ডায় আপনার পুত্র গাড়ু সেজে বসে আছে।'

তাই শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে বাপ ছুটলেন সেখানে। বলা বাহুল্য অমন জঘন্য জায়গায় পা না দিয়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়েই তিনি ছেলেকে যা-নয়-তাই বলে বকাবকি করতে লাগলেন। ছেলে এক হাত কোমরে দিয়ে, অন্য হাত বক দেখানোর ভঙ্গিতে শূন্যে তুলে, গাড়ু হয়ে বসে ছিল। গাড়ু তো আর কথা বলে না, তাই সে চুপ করে রইল।

বাপ তখন পথ থেকে একটা ছোট ঢিল তুলে ছেলের গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। গায়ে লাগতেই ছেলে বলল, 'ঠুং!' পেতলের গাড়ুতে ঢিল লাগলে তো ঠুং করবেই।

বাপ রাগে অন্ধ হয়ে, এক লাফে ঘরে ঢুকে, ছেলের কোমরে রাখা হাতটা ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে রাস্তায় ফেললেন। ছেলে ফুটপাথে কাৎ হয়ে পড়ে, বলতে লাগল গব্-গব্-গব্-গব্-গব্! গাড়ু উল্টোলে জল বেরিয়ে যাবে না?

পাড়াপড়শী

কত রকম পাড়াপড়শীর মধ্যিখানে জীবনটা কেটেছে ভেবেও আশ্চর্য লাগে। ছোটবেলায় এক সময় আমরা পদ্মপুকুর রোডে থাকতাম। পাশের বাড়িতে আমাদের পাতানো কাকাবাবুরা থাকতেন। তার ও পাশের বাড়িটা বেশ বড়, তিন তলা, গোলাপী রং করা, মস্ত সবুজ ফটক, তার ওপর মধুমালতীর ঝাড়। ফটক প্রায় সব সময় বন্ধ থাকত। কিন্তু রোজ দুপুরে দেড়টা-দুটোর সময় ঐ বাড়ি থেকে পুরুষ কণ্ঠে লোম-হর্ষণ চিৎকার শোনা যেত, 'ওরে বাবা রে! গেলুম রে! মেরে ফেললে রে! আর তো আমি নেই রে!'

প্রথমে যখন আমরা ঐ পাড়াতে বাস করতে এসেছিলাম, আমাদের বাড়ির ছেলেরা ভেবেছিল ও-বাড়িতে বুঝি ডাকাত পড়েছে! তাই লাঠি-সোঁটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের খোলার চালের বাড়ি থেকে বুড়ি ধোপানী ডেকে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন দাদাবাবুরা? ও-বাড়িতে গোটা-পাঁচেক মেয়ে-ছেলে আর একটা ঘর-জামাই ছাড়া কেউ থাকে না। ও কিছু না, রোজ এমন হয়। একটু না পেটালে সামলাবে কি করে?'

boiRboi.net

বাস্তবিকই বিকেল-বেলা বড় ফটক একটু ফাঁক হল আর মিহি করে কুঁচনো শান্তিপুরে ধুতি, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, চকচকে পামশু, ওপর হাতে মোটা তাগা, গলায় বিছে হার, আট আঙুলে আটটি পাথর বসানো আংটি পরে, সোনা-

বাঁধানো শিংএর ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, কোঁকড়া চুলে টেরি কেটে, ফরসা লম্বা-চওড়া ঘর-জামাইটি গুন-গুন করে গান গাইতে গাইতে আর চারদিকে আতরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে, হাওয়া খেতে যেত।

কখন ফিরত তাও দেখিনি আর বাড়ির সেই পাঁচজন মেয়ে-ছেলেকেও কখনো

BanglaBoi.net

দেখিনি। শুধু একজন ষণ্ডামতো ঝি রোজ সকালে থলি-চুপড়ি নিয়ে হন্‌হন্‌ করে বাজারে যেত আর বড় বড় গলদা চিংড়ি, কাটা পোনা, ফুলকপি, মটরশুঁটি, দই-রাবড়ির ভাঁড়, মিষ্টির বাক্স, ভালো ভালো ফল ইত্যাদি কিনে, হন্‌হন্‌ করে বাড়ি ফিরত। কেউ কথা বললেও উত্তর দিত না। প্রায় চার বছর ও-পাড়ায় ছিলাম কিন্তু এর বেশি দেখিওনি, শুনিওনি। ওদের নাম পর্যন্ত জানতে পারিনি।

অবিশ্যি ওদের বাড়ির খবরের অভাবটা ধোপার বাড়ি থেকে পুষিয়ে নেওয়া যেত। তাদের জীবনে গোপনীয়তার অবকাশও ছিল না, জায়গাও ছিল না। আমাদের রাস্তাটার পদ্মপুকুর ঠিকানা হলেও, আসলে ছিল সদর রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসা নিরিবিলি একটা গলি।

গলিটা আবার খানিকটা খোলা জমিকে বেড় দিয়ে গেছিল। সেই জমির এক কোণে, আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে, রাস্তার উল্টো দিকে, ধোপাদের খানকতক পাঁচিল-ঘেরা ঘর। ইঁটের দেয়াল, খোলার চাল, নারকেল গাছ, পেয়ারা গাছ, বেল গাছ ইত্যাদি। ঐখানেই ওদের বসবাস, ভাটিখানা, খোলা জমিতে কাপড় শুকোনো, যাবতীয় কাজকর্ম চলত।

বুড়ো ধোপা, ধোপানী, কয়েকটা ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনি, গাধা ইত্যাদি নিয়ে যন্ত্রের মতো ওদের সংসার কল চলত। সবাই উদয়াস্ত খাটত, মিলে মিশে থাকত, কাজ-কর্মও বোধ হয় সুষ্ঠুভাবে ভাগ করা ছিল। হাড়-পাজি নাতি-নাতনিগুলোর গলা ছাড়া, কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যেত না।

ওদের জীবনটা বইয়ের খোলা পাতার মতো ছিল। আমাদের ঘর থেকে একটু তাকালেই ওদের রান্নাঘরের হাঁড়িতে কি চড়েছে, তা পর্যন্ত দেখা যেত। বুড়ো আর ছেলেরা কাপড় কাচত, ইস্ত্রি করত। বুড়ি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ময়লা কাপড় সংগ্রহ আর কাচা কাপড় বিলি করত। বৌরা সারাদিন ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। নাতি-নাতনিরা কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ত। বাড়িটা থেকে সারাদিন একটা মৌচাকের মতো মৃদু গুঞ্জন শোনা যেত। বুড়ির সদাই হাসি-মুখ।

একদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল। ভোর থেকে ধোপার বাড়িতে চ্যাঁচামেচি হট্টগোল বকাবকি যাওয়া-আসা। কাজের চাকা বন্ধ। আমরা অবাক হলাম। একটু বেলায় বুড়ি ধোপানী এসে মায়ের কাছে কেঁদে পড়ল। 'মা, হয় একটা ওষুধ দাও, নয় একটা মাদুলী-টাদুলী দাও। আমাদের সর্বনাশ হয়েছে!' বলতে ভুলে গেছি আমার মা ছিলেন ওদের বে-সরকারি কবরেজ! সময়-অসময় ওরা মা-র কাছ থেকে একটু জোলাপ, কি ত্রি-ফলার জল, কি পুরনো ঘি, কি কাশির ওষুধ চেয়ে নিয়ে যেত। মায়ের ওপর ভারি বিশ্বাস।

আজ মা বললেন, 'দেখ, আমি তো আর ডাক্তার নই। বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে থাকলে, মোড়ের ডাক্তারবাবুকে ডাকো, নয়তো হাসপাতালে নিয়ে যাও।' বুড়ি কেঁদে বলল, 'তেমন ব্যামো নয়, মা। তাহলে তো ভাবনাই ছেল না! পই-পই করে

boiRboi.net

বড়-বৌটাকে বলি রেত থাকতে নেয়ে উঠে, খোলা চুলে, বেল-তলাতে যাস্‌নি। তা কে কার কথা শোনে। এখন ভূতে পেয়েছে! আমার অমন লক্ষ্মী বৌয়ের কি হাল হয়েছে দেখতে হয়।'

ভূতে পেয়েছে শুনে আমরা যে যার পড়াশুনা, কাজকর্ম ফেলে ছুটে এলাম। 'ও খনার মা, কি করে জানলে ভূতে পেয়েছে?' সে বলল, 'ওমা, তাও জানবনি? ভোরে উঠে রোজকার মতো মাড়ের গামলা তৈরি করে, মাথায় তুলে, খোলা চুলে, বেল-তলা দিয়ে হেঁটে এল। আক্কেলখানা দেখ!'

তা ওর শ্বশুর বলল, "তৈরি হয়েছে?" বৌ মুখের ওপর বলল, "হয়েছে কি না দেখই না!" এই বলে সমস্ত গরম মাড়টি বুড়োর মুখের ওপর ঢেলে দিল! সেই ইস্তক, ঘোমটা ফেলে বসে বসে কেমন ফিক্-ফিক্ করে হাসছে, দেখে এসো দিদিরা! ডাক্তার এয়েছিল, গুরুঠাকুর এয়েছিল। কেউ কিচ্ছু করতে পারেনি। এখন ওঝা ডাকতে গেছে।'

এই বলে চোখ মুছতে মুছতে বুড়ি বাড়ি গেল। ওঝা আসতে সন্ধ্যে হল। সারা-দিন বাড়িতে হাঁড়ি চড়ল না। ওদের বাড়ির উঠোনে হ্যাজাক জ্বলল। কতক দেখতে পেলাম, কতক আন্দাজ করলাম। বৌকে এনে উঠোনের মধ্যিখানে চাটাইয়ের ওপরে বসাল। সে তখনো ফিক্‌ফিক্ করে হাসছে। তারপর তার নাকের তলায় কড়া গোছের কিছু পোড়ানো হল। আমাদের পর্যন্ত হাঁচি পেতে লাগল। ভূত তবু ছাড়ল না।

ততক্ষণে কাকাবাবুর বাড়ির প্রায় সবাই আমাদের দোতলার বারান্দায় জড়ো হয়েছে। গলায় আট-দশটা বড় বড় পুঁতির আর পাথরের মালা পরা, মাথায় ফাট্টা বাঁধা, আলখাল্লা গায়ে দাড়িওয়ালা বুড়ো ওঝা যতই বলে, 'বল্, ওকে ছেড়ে যাবি?'

বৌ মাথা দুলিয়ে বলে, 'যাঁব না, যাঁব না! তুঁই কিঁ কঁরবি কঁর!' ওঝা তখন দস্তুরমতো রেগেমেগে একটা নতুন নারকেল-ঝাঁটা এনে বৌটাকে আগা-পাশতলা পেটাতে আরম্ভ করল।

বৌ-ও তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়রাণ হয়ে বলল, 'ওঁরে বাবা! ছাঁড়ান দে! আমি যাঁচ্ছি! যাঁচ্ছি!'

ওঝা বলল, 'তাহলে বাউরিপাড়ার পুকুরপাড়ের তেঁতুল-গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে চলে যাস্, তবে বুঝব সত্যি গেছিস্!' বৌটা আচ্ছন্নের মতো শুয়ে পড়ল।

কে যেন সেখানে ছুটে গিয়ে দেখে এসে বলল, 'ভেঙেছে! ভেঙেছে!'

আর বৌ-ও ভালোমানুষের মতো উঠে বসে, চারদিকে এত লোকজন দেখে, ঘোমটা টেনে দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। এর সবটা আমরা দেখিনি। বাকিটা পরদিন ঠাকুরের বাতাসা ভোগের প্রসাদ নিয়ে, খনার মা এসে হাসিমুখে বলে গেছিল।

BanglaBook.net

চোর

ত্রিশ বছর আগে সম্পাদকমশাইরা গল্প চাইলেই আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'কিসের গল্প লিখব?' তাঁরা বলতেন, 'হয় প্রেমের, নয় ভূতের, নয় চোরের।' কাজেই আমিও বুঝে নিলাম ঐ তিনটিই হল ছোট গল্পের প্রধান উপজীব্য। তারপর অনেক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি ঐ তিনটির মধ্যে আবার শেষেরটিই হল প্রধান, প্রথমটি নয়। এখন দেখছি চারদিকে ছড়িয়ে আছে চোরের গল্পের সামগ্রী। জ্যান্ত জ্যান্ত চোরের গল্প, বানাতেও হয় না।

কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনেই বেজায় চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছিল। কেউ তার কোনো কিনারা করতে পারে না ; একটা দুষ্কৃতকারীও ধরা পড়ে না। মাঝে-মাঝে রাতে দলবল নিয়ে এসে জানলাটানলার শিক ভেঙে ঢুকে, বেবাক সামগ্রী পাচার করে দেয়। বাড়ির লোকে এমনি ঘুমোয় যে কিচ্ছু টের পায় না। কখনো কখনো গানের আসর, যাত্রা কিম্বা নাটক-টাটক হলে, অনেকে বাড়ি বন্ধ করে, সদর দরজায় তালা দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে নাটক দেখে, বাড়ি ফিরে দেখে সব চাঁচা-পোঁছা! কেউ ধরা পড়ে না।

এই সময় এক ছোকরা অধ্যাপক বিলেত থেকে সদ্য এসে কাজে যোগ দিলেন। সঙ্গে আনলেন খাসা ট্র্যান্‌জিস্টর, রেকর্ড প্লেয়ার ইত্যাদির সঙ্গে চমৎকার এক হাত-ঘড়ি। ব্যাচেলর মানুষ, সংসারের ঝামেলা নেই। খালি বাড়ি ফেলে নাটক দেখে ফিরে এসে দেখে তালা যেমনকে তেমন ঝুলছে। কিন্তু ট্র্যান্‌জিস্টর নেই, রেকর্ড-প্লেয়ার নেই আর সব চাইতে খারাপ হল যে হাত-ঘড়িটাও সেদিন ভদ্রলোক হাতে পরেননি, পাছে ভিড়ের মধ্যে হারায়। সেটিও নেই।

ছোকরা অধ্যাপক সহজে ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। সে থানায়-টানায় গিয়ে মহা সোরগোল তুলল। ফলে চোরাই মালের একটা তালিকা তৈরি করে, থানায় থানায় দেওয়া হল। সবাই তাই নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। কিছুদিন কেটে গেল। সবাই বলল, হ্যাঁ, ঐ করে চোর ধরা পড়লেই হয়েছে!

এমন সময় ইলেম-বাজারের কাছাকাছি একটা পানের দোকানে থানার একজন ছোকরা সাব-ইন্সপেক্টর পান কিনতে গেছে। হঠাৎ মনে হল পানওয়ালার হাতে বাঁধা হাত-ঘড়িটাকে যেন চেনা-চেনা লাগছে! পান কেনা হলে, উঠি-পড়ি করে ছোকরা থানায় ফিরে গিয়ে, তালিকাটা আরেকবার পড়ে দেখল। হ্যাঁ, এই তো সে-ই!

তখন পুলিস-পেয়াদা নিয়ে পানওয়ালাকে ধরে জেরা করে জানা গেল যে ওদিককার কোনো গ্রামের একজন চেনা লোক ঐ ঘড়িটি বন্ধক দিয়ে একশো টাকা

boiRboi.net

ধার নিয়েছে। সেই চেনা লোকটির ঠিকানা জোগাড় করা হল। সেখানে পেঁছে দেখা গেল মস্ত এক চালা ঘর। চালা ঘরের চার্জে একজন আধাবয়সী মহিলা।

তখন বেশ রাত। মহিলা বললেন, 'আমার ছয় ভাই এ বাড়ির মালিক। তারা নাইট্-ডিউটি করে, বোলপুরের ওদিকে। এখন আমি ঘরটর খুলতে পারব না।'

পেয়াদারা তখুনি বিদায় নিয়ে একটা আম-বাগানে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। ভোরে নাইট-ডিউটি সেরে, দ্রব্যাদি নিয়ে ছয় ভাই ফিরলেই তাদের গ্রেপ্তার করা হল। সমস্ত চোরাই মালও উদ্ধার হল। শোনা গেল এটা ব্রাঞ্চ-আপিস, হেড-কোয়ার্টার কলকাতায়।

আরেকবার বিকেলের গাড়িতে আমাদের প্রতিবেশী অমরবাবু তাঁর স্ত্রী আর শ্যালীকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। ট্রেন দু-ঘণ্টা লেট। পথেই রাত হবে। শীতের বেলা, এখনি অন্ধকার হয়ে আসছে, ওঁরা গাড়ির দরজা-জানলায় ছিট্‌কিনি এঁটে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন।

সেকালের সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ি। ওঁরা ছাড়া তিনজন যাত্রী। তাদের মধ্যে এক বেচারা বৌ ঘোমটা টেনে একধারে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। আর দুজনের মধ্যে একজনকে বেশ পয়সাওয়ালা ভারিক্কে ধরনের মনে হল। সঙ্গে লটবহর, নতুন স্যুটকেস্, বাজারের থলি তাতে তাজা পালং, মুলো। তৃতীয় ব্যক্তি বোধ হল ওঁরি মোসায়েব। সারাক্ষণ হ্যাঁ কর্তা, যা বলেছেন কর্তা, করছিল।

ওঁদের কথায় মনে হল কর্তার মেয়ের বিয়ের জন্য কলকাতা যাওয়া হচ্ছে। পরিবারবর্গ আগেই চলে গেছে।

কর্ড লাইন দিয়ে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে গাড়ি চলেছে। আলো নিবু-নিবু। হঠাৎ অন্ধকারে থেমেই গেল। সময়কাল খারাপ। সবাই তটস্থ। বৌটি একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। চারদিক থমথম করছে। তারি মধ্যে হঠাৎ বৌটি উঠে দরজার ছিট্‌কিনি খুলে অন্ধকারে নেমে গেল!

সবাই ব্যস্ত হয়ে 'হাঁ-হাঁ-হাঁ—ও কি করছেন—ও কি করছেন!' বলতে না বলতে অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল! আর চারজন সশস্ত্র যুবক কামরায় ঢুকে বলল, 'যার যা আছে ভালোয় ভালোয় দিয়ে দিন। গোলমাল না করলে আমরাও কিছু বলব না।'

বলা বাহুল্য, যার যা ছিল, চুড়ি, হার, আংটি, বোতাম, হাতঘড়ি, মনিব্যাগ—সব পাচার হয়ে গেল। তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে ভারিক্কে ভদ্রলোকের নতুন স্যুটকেসটিও তুলে নিয়ে তারাও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ পরে হট্টগোল শোনা গেল। ড্রাইভার, গার্ড, অন্যান্য যাত্রীরা নেমে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। আরো পরে গাড়ি আবার ছাড়ল। বড় স্টেশনে নাকি রেলের পুলিসের কাছে ডাইরি হবে। হারানো সম্পত্তির ফর্দ দিতে হবে।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই মোসায়েব বললেন, 'আমাদের তো অল্পের ওপর দিয়ে গেল। বড় ক্ষতি হল আপনার।' সবাই বলল, 'কেন? কেন? কিসের বড় ক্ষতি?' মোসায়েব বললেন, 'ঐ যে স্যুটকেস্‌টি নিল, ওতে কর্তার মেয়ের বিয়ের দশ হাজার

টাকার গয়না ছিল।—ও কি স্যার, মাথা নাড়ছেন কেন?'

কর্তা বললেন, 'ছিল না!'

'ছিল না? তবে গয়নাগুলো গেল কোথায়?'

বুড়ো আঙুল দিয়ে বাজার থলি দেখিয়ে কর্তা বললেন 'মূলোর মূলে!' তাঁর বুদ্ধি দেখে সবাই হাঁ!

সুখের বিষয়, তিনদিন বাদে দলটি ধরা পড়ল, জিনিসপত্রও উদ্ধার হল। বৌটি—যাক্‌গে, এইসব কাঁচা মাল দিয়েই চোরের গল্প তৈরি হয়। বানাতে হয় না।

boiRboi.net

দজ্জাল মেয়ে

পৃথিবী জুড়ে সবাই যখন নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে, আমার তখন হাসি পায়। কারণ আমাদের দেশে এতকাল মিটিং-টিটিং না করেই, হাত-রুটির বেলনা আর মুড়ো ঝাঁটার সাহায্যে আমরা যে নিজেদের অধিকার রক্ষা করে এসেছি, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখতে পাওয়া য়ায়। বক্তৃতা-টক্তৃতা করেও যা হয় না—সে চেষ্টাও নিরিবিলিতে প্রচুর করা হয়েছে—একটা সামান্য কাঠের বেলনা দিয়ে যদি তা সম্পন্ন করা যায়, তাহলে মন্দ কি? ভেবে দেখুন কত সময়, পরিশ্রম আর খরচ বেঁচে যায়।

দাক্ষিণাত্য আমাদের এক বন্ধুর দেশ। সেখানকার মেয়েরা কোনোকালেও পরদার আড়াল হয়নি। তাদের আচার-আচরণ দেখে এখনো তার পরিচয় পাওয়া যায়। কি তাদের দাপট! দেখে ভক্তি হয়। তারি মধ্যে আমাদের বন্ধুর পিসিমা ছিলেন অনন্যা। তাঁর ভয়ে পিসেমশাই মুখে রা কাড়তেন না। বন্ধু-বান্ধবরা তাই নিয়ে হাসাহাসি করতেন। বলতেন—এ-রাম! বৌকে ভয় পায়!

গাঁয়ের কুয়ো-তলার সামনে শম্ভু বলে এক বন্ধুর বাড়িতে রোজ তাঁদের বৈকালীন আড্ডা বসত। গাঁয়ের গিন্নিরা আর মেয়েরা ঐ সময় পানীয় জল তুলতে এসে, কুয়োর পারে গল্প-গুজব করত। একদিন তাদের মধ্যে পিসিমাকে দেখে, শম্ভু বলল, 'ঐ যে তোর বৌ! তুই তো ওর সামনে ঠোঁট ফাঁক করতে ভয় পাস্!' তাই শুনে বাকিদের কি বিশ্রী হাসি!

পিসেমশায়ের আঁতে ঘা লাগল। তিনি বললেন, 'ও তোমাদের ভুল ধারণা। তোমাদের মতো কথায়-কথায় বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করি না বটে, কিন্তু দরকার হলে কষে দু-কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়ি না! ও মাথা নিচু করে শোনে, তা জানিস্! ওকে আমি থোড়াই কেয়ার করি! চাও তো তার প্রমাণ দিতে পারি!'

বন্ধুরা আরো মজা পেয়ে বলল, 'বেশ, দশটাকা বাজি। কাল বিকেলে তুমি আমাদের সামনে বৌকে আচ্ছাসে দু-কথা শোনালে, ও কেমন মাথা নিচু করে শোনে, তার প্রমাণ দিও।'

বাড়ি ফিরেই পিসেমশাই পিসিমাকে বললেন, 'কাল দশ টাকা রোজগার করতে চাও?' পিসিমা ইড্‌লি তুলতে তুলতে বললেন, 'কি করতে হবে?' পিসেমশাই ঢোঁক গিলে বললেন, 'কিচ্ছু না। আমি কুয়ো-তলায় গিয়ে তোমাকে দুটো কড়া কথা বলব, তুমি মাথা নিচু করে শুনবে।'

পিসিমা ইড্‌লির পাত্র চাপা দিয়ে বললেন, 'এগারো টাকা।' পিসেমশাই বললেন, 'বেশ, তাই সই!' আত্মসম্মানের কাছে একটা টাকা কিচ্ছু না।

BanglaBook.net

পর দিন যথাসময়ে পিসিমা কুয়ো-তলায় পেঁছে, জল তুলে, বন্ধুদের সঙ্গে দুটো কথা বলছেন, এমন সময় পিসেমশাই সেখানে দাপাতে দাপাতে গিয়ে বললেন, 'তুমি ভেবেছ কি লক্ষ্মীয়াম্মা! বাড়ির কাজ ফেলে রোজ সন্ধ্যা অবধি গাল-গল্প আমি আর সইব না। যাও, বাড়ি যাও!'

তাই শুনে বন্ধুদের এবং পাশের বাড়ির দালানে বসা পুরুষ দর্শকদের অবাক করে দিয়ে, পিসিমা কাঁচুমাচু মুখ করে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ওতেই পিসেমশাইয়ের কাল হল। অনাস্বাদিত বিজয়-গর্ব তাঁর মাথায় চড়ল। গিন্নিকে মাথা নিচু করে বেণী দুলিয়ে চলে যেতে দেখে, তিনি আর লোভ সামলাতে পারলেন না। দিলেন বেণী ধরে হেঁচকা টান।

আর যায় কোথা! অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে পিসিমা বললেন, 'এ মত তো কথা ছিল না!' বলে এক নিমেষের মধ্যে পিসেমশাইকে একেবারে মাটির সঙ্গে বিছিয়ে দিয়ে, দুম্-দুম্ করতে করতে বাড়ি চলে গেলেন। ব্যাপার দেখে পিসে-মশায়ের বন্ধুরা থ'! বলা বাহুল্য কেউ টাকাকড়ি পেল না।

কথায় বলে মেয়েদের অসাধ্য কিছু নেই, তারও একটা নমুনা দিচ্ছি। তবে এ গল্পের সত্যমিথ্যার জন্য আমি দায়ী নই। লোকে বলত কলকাতায় বা তার আশে-পাশে, দুশো টাকা ভাড়ার মধ্যে এমন বাড়ি ছিল না, যেখানে লাটুবাবু আর তাঁর স্ত্রী কিছুদিন বাস করেননি। সব বাড়ি ছাড়ার একটাই কারণ, সেটি হল ঐ গিন্নি। হয় বাড়ি পছন্দ নয়, নয় বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া, নয় পাশের বাড়ির ভাড়াটেদের

boiRboi.net

বরদাস্ত করা যায় না, নয় আর কিছু।

এমনি করে খুঁজে খুঁজে যখন শহরের সমস্ত দুশো টাকার ভাড়া-বাড়ি শেষ করে এনেছেন, তখন আপিস ফেরার পথে এক দালাল এসে লাটুবাবুকে ধরল। বেহালা অঞ্চলে নাকি একটা চমৎকার বাড়ি পাওয়া যেতে পারে, সেখানে এক রাত বাস করতে পারলে, পরের ছয় মাস ভাড়া দিতে হবে না এবং তার পরেও ঐ দুশো টাকা।

লাটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে দালাল সমভিব্যাহারে মালিকের বাড়ি গিয়ে চুক্তিপত্র সই করে এলেন। সেখান থেকে বেরিয়েই দালাল বলল, 'দেখুন একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি, এখন তাই বিবেকে বাধছে।' 'কি আবার কথা?' 'বাড়িটা একবার দেখলেন-ও না—' 'দেখার কি আছে, সব বাড়িই এক। গিন্নি কোথাও বেশি দিন থাকেন না। কিন্তু কথাটা কি শুনি?'

আমতা-আমতা করে সে বলল, 'ইয়ে—মানে রোজ রাতে যে লোকটা আসে, সে মানুষ নয়।' লাটুবাবু একবার থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'ও-সব গিন্নি সামলাবেন। আমার রোজ নাইট-ডিউটি থাকে। কাল ভোরে এসে বাড়িটা একবার দেখিয়ে দেবেন।'

হাতে হাতে জিনিসপত্র গোছানো হল। যাযাবর পরিবারের বাড়তি জিনিস থাকে না। পরদিন সকালে বাড়ি দেখে গিন্নি মহা খুসি। এমন ভালো বাড়িতে তিনি নাকি জন্মে কখনো থাকেননি। আশেপাশে লোকালয় নেই, সব খোলা মাঠ। তাই দেখে লাটুবাবুও অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

হাতে হাতেই জিনিসের বেশির ভাগ গোছানো হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে খেয়ে-দেয়ে টিপিন নিয়ে লাটুবাবু তাঁর খবরের কাগজের আপিসে গেলেন। ভোরে এসে ভয়ে ভয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। কাজটা বোধ হয় ভালো হয়নি। কে জানে কি দেখতে কি দেখবেন।

গিন্নি কিন্তু হাসিমুখে দরজা খুলে দিয়ে, পরটা ভাজতে বসলেন। খেতে খেতে লাটুবাবু চারদিকে চেয়ে দেখলেন, সব কিছু কাল যেমন রেখে গেছিলেন তেমনি আছে। খালি তাঁর শ্বশুরমশায়ের কাঁঠাল কাঠের মুগুরটা তাকের ওপর শোভা পাচ্ছে।

সেদিকে তাকাতেই, তাঁর পাতে আরো দুটো পরটা দিয়ে গিন্নি বললেন, 'কি দেখছ? কাল রাতে যে ভারি মজা হয়েছিল। কোথা দিয়ে কে জানে, এক ব্যাটা চোর এসেছিল। অমনি সুড়সুড় করে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। পকেট থেকে এক গাছা দড়ি ঝুলেছিল।

আমি রান্নাঘরে বাসনের বাক্স খুলেছিলাম। ব্যাটাকে দেখে বাক্স থেকে বাবার ঐ মুগুরটা না নিয়ে, পেছন থেকে ছুটে গিয়ে ব্যাটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আগাপাছতলা এমনি পেটান পেটালাম যে হতভাগা ট্যাঁফুঁ করতে পারল না। কি সব গায়ে দিয়ে

এসেছিল, খালি-খালি ফস্কে যাচ্ছিল, যেন শূন্যে থামচাচ্ছি! তবু ছাড়িনি, শ্যাম গোঁসাইয়ের মেয়েকে চেনেনি লক্ষ্মীছাড়া। শেষটা মারের চোটে নাকটা ভেঙে গিয়ে থাকবে।

তখন আবার পায়ে পড়ে বলতে লাগল, 'হেঁই মা, ছাঁড়ান দিন, ছাঁড়ান দিন, আঁর ক'ক্ষণো এ'খানে আঁসব না, এ'ই নাঁকে খ'ৎ দিলাম!'

তাপ্পরেই এমনি চালাক, প্রায় আমার মুঠোর মধ্যে থেকে খসে কোথায় সে পালাল। মুগুর হাতে কত খুঁজলাম আর দেখতে পেলাম না। এ্যাঁ, ও কি হল!'

কি আর হবে, লাটুবাবু মুচ্ছো গেলেন।

বলা বাহুল্য, নেই-মানুষটা আর আসেনি। ছয় মাস বিনি ভাড়ায় থাকার পর, লাটুবাবু সস্তা দরে বাড়িটা কিনে ফেলেছেন।

মাছ-ধরা

ভ্রমণের কথা বলতে গেলে, আমার দৌড় হল কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন, আবার শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা। একটা গাড়ি ছিল, সেটা বোলপুর ছাড়ত বেলা চারটের পর আর হাওড়া পেঁছত রাত সাড়ে আটটা। ঘণ্টা চারেকের ওয়াস্তা। 'ছাড়ত' বলছি, কারণ এখন আর ও-গাড়িতে যাতায়াত করি না। তবে এ কথা বলতে বাধা নেই যে যাত্রাটি ছিল বড়ই রোমাঞ্চকর।

প্রথম কথা গাড়িটির এক ঘণ্টা আগে-পরে আসা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এ-লাইনে কুড়ি মিনিট লেট্‌কেও আমরা অন্‌-টাইম বলি। রোমাঞ্চ অন্য কারণে। গাড়ির বাতিগুলো ছিল কেমন যেন। ট্রেন ছাড়লেই জ্বলে উঠত ; যতই বেগ বাড়ত ততই জোরালো হয়ে উঠত, কিন্তু কোনো স্টেশনে এসে ঢুকলে, কমতে কমতে শেষটা নিবেই যেত। কে নামল, কে উঠল কিছুই মালুম দিত না। হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকার কথা কয়ে উঠত।

একবার ঐ গাড়িতে কলকাতা ফিরছি আমরা জনা তিনেক। আলোও ঐ রকম বাড়তে বাড়তে কমতে কমতে, শেষটা এক্কেবারে নিবে গেল। কর্ড লাইন দিয়ে চলেছি। এটুকু টের পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে এক দল লোক লটবহর নিয়ে গাড়িতে উঠল, এটুকু টের পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু একটা গন্ধে কামরা ভরে গেল আর আমার জ্যাঠা-

BOIRBOI.net

মশাইদের জন্য বড়ই মন কেমন করতে লাগল। কোন কালে তাঁরা স্বর্গে গেছেন, এখন হঠাৎ কেন তাঁদের জন্য মন কেমন করবে ? ট্রেনের বেগটা একটু বাড়তেই আলোও জ্বলে উঠল, আমিও মন-কেমনের কারণ বুঝলাম।

যাঁরা উঠেছিলেন তাঁদের কাপড়চোপড় আলুথালু, অপরিষ্কার, নাকমুখ রোদে-পোড়া কালো ভূত। কিন্তু চোখে সুগভীর তৃপ্তি। সঙ্গের লট-বহর হল লম্বা লম্বা বাঁশের ছিপ, গোল গোল বেতের চুপড়ি, তাতে কালো কালো কিছু কিলবিল করছে আর একটা ময়লা ন্যাকড়া-বাঁধা কাঠের বাক্স, তার ভেতর থেকে ভুর-ভুর করছে মশলার গন্ধ। প্রাণটা আঁকুপাঁকু করে উঠল। এ যে আমার বড় চেনা গন্ধ, খুব একটা সুগন্ধ হয়তো নয়, কিন্তু নাকে যেতেই হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোজা ভাষায় এটি মাছ-ধরার চারের গন্ধ।

অর্থাৎ কিনা ছুটির দিনে এঁরা দল বেঁধে মাছ ধরে ফিরছেন। সেই স্টেশনটাকে তখন চিনতে পারিনি, নামও পড়তে পারিনি, কিন্তু এখন আর বলে দিতে হবে না। ও ডানকুনি না হয়ে যায় না। ডানকুনি সেকালে ছিল মাছ-ধরিয়েদের স্বর্গ। এখনো তাই কি না বলতে পারি না। খালি মনে মনে বলি, তাই যেন হয়, দেড়শো বছরের পুরনো কালো পুকুরগুলোকে যেন বুজিয়ে না দিয়ে থাকে !

জ্যাঠামশাইদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনজন হাতে ছিপ, গাছে পিঠ দিয়ে সারা ছুটির দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। নষ্টের গোড়া বড়জ্যাঠা, সারদারঞ্জন। সেজ মুক্তিদারঞ্জন আর ছোট কুলদারঞ্জন তাঁর ভক্ত শিষ্য। এঁরাও সন্ধ্যা নামলে পর ঐ রকম কালো মুখ আর চোখে তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। মাছ পড়া কি না পড়ার সঙ্গে যে ঐ তৃপ্তির কোনো সম্বন্ধ নেই, সেটা বুঝতে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি। আসল কথা হল সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়া, মাছ ধরতে বসা আর বাড়ি ফিরে মাছ ধরার গল্প করা।

খুব সহজ কাজ নয় প্রথম দুটি। এর জন্যে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। শুধু একটা মেছো পুকুর খুঁজে পেলেই হল না। পুকুরের মালিকের সহানুভূতি থাকা চাই, কিন্তু শখ না থাকলেও চলে। বেশি অতিথিপরায়ণ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ তা হলে হয়তো ঠিক যখন যে-কোনো মুহূর্তে ফাতনা ডুবতে পারে মালুম দিচ্ছে, তখন মালিক এসে পোলাও আর চিংড়ি মাছের মালাই-কারি খাবার জন্য পেড়াপিড়ি করে, দিনটাকেই মাটি করে দিতে পারেন। সহযোগ থাকবে, কিন্তু বেশি আগ্রহ থাকবে না, এই হল আদর্শ মালিকের লক্ষণ।

তারপর যাতায়াতের ভালো ট্রেন থাকা চাই, অকুস্থলে পৌঁছতে যেন অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটির দরকার না হয়। আর আসল কথা পুরুষ্টু কেঁচো আর তাজা বড় সাইজের পিঁপড়ের ডিমের সন্ধান জানা চাই। ছিপ বঁড়শী ইত্যাদি নিয়ে কোনো সমস্যাই ছিল না। এস্‌প্ল্যানেডে বড় জ্যাঠার খেলার সরঞ্জামের দোকান ছিল। বর্মা থেকে বাছাই করা ছিপের বাঁশ আসত, ফ্রান্স অবধি চালান যেত।

amarboi.net

আরো কিছু দরকার। মাছ-ধরিয়েদের অদ্ভুত সংযম থাকা চাই, যাতে সমান নেশা-গ্রস্ত হয়েও সারা দিনের মধ্যে গল্প করে, কি হাত-পা নেড়ে ছায়া ফেলে, টোপ গিলবার আগের মুহূর্তে কেউ সম্ভাব্য মাছ না ভাগায়! পরে বাড়ি ফিরে যত খুশি হাত-পা নেড়ে, যে-সব মাছ পালিয়ে গেল তাদের মাপ-জোক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সুদ্ধ যত খুশি গল্প করা যেতে পারে।

যাদের সত্যিকার মাছ-ধরার নেশা নেই, তারা এমনিতেই বড় মাছ ধরা পড়েনি দেখে রেগে থাকে। কাজেই যে-সব বিশাল বিশাল মাছ ধরা পড়েও খেলাতে গিয়ে পালিয়ে গেছে, হয়তো একটা ফার্স্ট ক্লাস্ বঁড়শী নিয়েই ভেগেছে—তাদের গল্প শুনবার ধৈর্য এদের থাকে না, বিশ্বাসও করে না। অতএব খানিকটা রং চড়িয়ে বললেও দোষ হয় না।

যাই হোক, মশলার কথা বলা হল না। বড় জ্যাঠা একটা চার বানিয়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'ইধর আও!' তাঁর দেখাদেখি যোগীন সরকার-ও একটা বানালেন। তার নাম দিলেন, 'উধর মৎ যাও!' সুখের বিষয় মাছরা তাঁর কথা শুনল না। ও-চার চলল না।

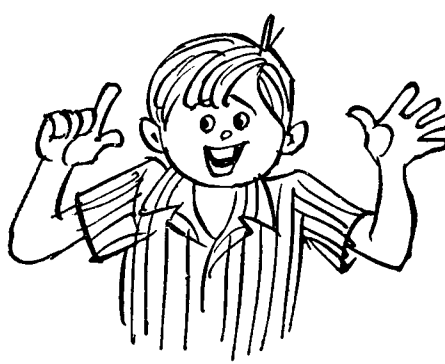

শুনেছি জলের ওপর বড় জ্যাঠার একটু ভালো চার ছড়িয়ে দিলেই, পুকুরের চারকোণা থেকে মাছরা ছুটে এসে, মাত্র তিন-চারটে টোপ দেখে মহা চটে, অপেক্ষা করে থাকত। কিন্তু জ্যাঠামশাইদের বলতে শুনেছি মশলা দিয়ে ভুলিয়ে, কি আলো দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে মাছ ধরা খুব স্পোর্টিং নয়।

বুড়ো বয়সে ছোট জ্যাঠা একবার মেয়ে আর নাতি-নাতনী নিয়ে শিমুলতলা গেছলেন। সঙ্গে ছিপ বঁড়শী ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছেন দেখে সকলের কি হাসাহাসি! ওখানকার দুধ ডিম মাখন মুরগি পেলেই যথেষ্ট, তার ওপর বুড়োর শখ দেখ! সেখানে ভালো পুকুর আছে কি না তাও জানা নেই।

ছোট জ্যাঠার বয়স সত্তরের ওপরে, সঙ্গী সাথী না পেলে মাছ ধরতে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু নেশাগ্রস্তদের আলাদা এক দেবতা আছেন। তিনি তাদের দেখাশুনো করেন। ওখানে পেঁাছেই মেছো পুকুর, খ্যাপাটে সঙ্গীসাথী সব জুটে গেল।

জ্যাঠামশাই রোজ সকাল সকাল খেয়ে ছিপ নিয়ে রওনা দেওয়া আর সন্ধ্যার আগে পোড়া-মুখ নিয়ে ফেরা ধরলেন। আর রোজ বড় বড় গল্প বলতে লাগলেন এই ঢাউস ঢাউস মাছ কি ভাবে ফাঁকি দিয়ে ফস্কে পালিয়েছে। বলা বাহুল্য কেউ বিশ্বাস করত না।

শেষটা এক দিন বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে ফিরে, বে-পরোয়া ভাবে বলে বসলেন, 'জানিস্, আজ একটা বিশ-সের ধরেছিলাম। সে কি খেলান খেলাল রে বাপ, জান বের করে দিল! আমি কি একলা পারি! মৃগাঙ্ক এসে হাত লাগাল। দুজনে মিলে এক ঘণ্টা খেলিয়ে, কাবু করে এনে তবে তোলা হল!'

মেয়ে মুখ হাঁড়ি করে বলল, 'কোথায় সে মাছ?' জ্যাঠামশাই কাঁচুমাচু মুখে বললেন 'মৃগাঙ্ককে দিয়ে দিলাম। আমাদের তো অত বড় বঁটি নেই!' তাই শুনে সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

ঠিক সেই সময় বাইরে ডাকাডাকি। নাতি এসে খবর দিল, 'মৃগাঙ্কবাবু সের পাঁচেক মাছ কাটিয়ে নিয়ে এসেছেন।'

ব্যস্! সব থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল!

কুকুর

শান্তিনিকেতনের আদি কুকুরগুলোকে দেখে নাগরিকতার প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়। আদি বলছি এই জন্য যে ওখানকার স্থানীয় কুকুরদের জাতই আলাদা। প্রাচীন গুহার দেয়ালে যে-সব ছবি আঁকা দেখা যায়, তাতেও এই জাতের কুকুর দেখা যায়। পাতলা গড়ন, সরু সরু হাড়, চিক্কণ নাক-মুখ, ছোট ছোট সুন্দর থাবা। পাটকিলে চোখের ভেতরে তাকালে মনে হয় তলায় কোথায় আলো জ্বলছে। দু চোখের কোণে নাকের দু-পাশে একটি করে শাদা দাগ। বেশির ভাগের গায়ের রং লালচে, কিম্বা শাদায় লালচেতে মেশানো, কদাচিৎ কালো। দুঃখের বিষয় ক্রমে এরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছে।

শুধু চেহারাতেই ওদের বৈশিষ্ট্য নয়, ওদের সামাজিক ব্যবস্থা দেখলে অবাক

হতে হয়। আজকাল শান্তিনিকেতনে যে সব বড় সাইজের পুরুষ্টু উট্‌কো কুকুর দিন-রাত খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বেড়ায়, আমি তাদের কথা বলছি না। তারা সব হালের আমদানি, সুবিধাবাদী। তাদের সঙ্গে আদি কুকুরদের কোনো সাদৃশ্যই নেই। না চেহারায়, না ব্যবহারে। আদি কুকুরদের আজকাল বেশি দেখি না।

মনে হয় আদি কুকুররা সমস্ত আশ্রমটাকে কয়েকটা এলাকায় ভাগ করে ফেলেছিল। যে যার নিজের এলাকাতেই টহল দিত। পরের জমিদারিতে নাক গলাত না। যদি কখনো কারো মতিভ্রম হত এবং সে অন্যের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করত, তাহলে সে-পাড়ার ন্যায্য কুকুররা দল বেঁধে সোৎসাহে ও সরবে তাদের তাড়া দিত। আশ্রমের দূর দূর সীমানা থেকেও সেই কুকুর-খেদানি শব্দ শোনা যেত।

একই এলাকার কুকুরদের মধ্যে কখনো ঝগড়া হতে দেখিনি। তার কারণ পাড়ার কুকুররা নিজেদের মধ্যে বাড়িগুলোকে ভাগ করে নিয়েছিল। কোন বাড়িতে কোন বেলা কে খাবে এ-সব নির্দিষ্ট হয়ে ছিল। কোন বাড়ির লোকরা কখন খায়-দায়, তাও ওদের ভালো করেই জানা ছিল। মক্কেল চটালে নিজেদেরি ক্ষতি তা-ও জানত। কার কতখানি দৌড় তা-ও ওদের অজানা ছিল না। আমাদের বাড়িতে কখন সকালের জলখাবার, দুপুরের খাওয়া, রাতের খাওয়া হয়, তাতে ওদের কখনো ভুল হত না।

আগেকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা অনেকটা ভেঙে পড়লেও, আজ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের কুকুরদের আত্ম-সম্মান দেখে আশ্চর্য হই। হ্যাংলার মতো ঘোরে না ওরা। যাদের পালা তারা আমাদের হাতার ভেতরে আসে। বাকিদের তারের বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

আমরা খেতে বসলে দল থেকে দুটি কুকুর তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে, জানলার বাইরে চুপ করে বসে থাকে। শুধু দু-জোড়া কান আর দু-জোড়া চকচকে চোখ দেখা যায়। ক্যাঁওম্যাও নেই, হাঁচড়-পাঁচড় নেই। মনটা আগের থেকেই নরম হয়ে যায়। আগন্তুকদের নিয়ম মাঝে মাঝে একটু বদলায়। দুটো বয়স্ক কুকুরের বদলে একটা মা আর দুটো খিদে-পাওয়া ছানা আসে।

কেউ দাও-দাও করে না। বাসনপত্র তুলে নিয়ে গেলে ওরাও উঠে রান্নাঘরের দরজায় বাইরে দাঁড়ায়। জানে এবার ভাগ পাবে। খাওয়া হলেই, নিঃশব্দে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে, তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে দলের সঙ্গে মিলে, ওরা পাশের বাড়ির বাইরে দাঁড়ায়। সেখানে আর দুজনের পালা।

কেউ ওদের ওপর বিরক্ত হয় না, কারো ওপর ওরাও জবরদস্তি করে না। মানুষের সমাজে এমন ভালো ব্যবস্থা দেখিনি। অবিশ্যি ওদের সব নিয়ম সব সময় বোঝা যায় না। মনে হয় কার বাড়িতে কে রাত কাটাবে তাও নির্দিষ্ট থাকে। আশ্রমবাসীরাও মিনি-মাগনা পাহারাওয়ালা পেয়ে খুশিই হন।

তবে একেক সময় অন্য পাড়ার উচ্ছৃংখল কুকুররা বে-আইনী ভাবে অনুপ্রবেশ করবার তালে থাকে। ন্যায্য কুকুররা তা হতে দেবে কেন? এই সব ক্ষেত্রে রাত-বিরেতে

পিলে-চম্‌কানি গণ্ডগোল হয়। সবাই রেগে চতুর্ভুজ! আসল ব্যাপারটা বুঝতে আমার কম করে ৫ বছর লেগেছিল।

অনেক সময় দেখি কুকুররা যাদের বাড়িতে খায়, রাতে তাদের বাড়ি পাহারা দেয় না। অন্য বাড়িতে টহল দেয়। সে-বাড়িতে হয়তো একজন উট্‌কো ব্যাচেলর থাকেন, আশ্রমের রান্নাঘরে খান, বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। কাজেই কুকুররা সেখান থেকে বিশেষ কিছু আশা করে না। তবু রাতে দু-একজন ঐ বাড়িই পাহারা দেয়। ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। আশ্রমের চৌকিদারকে পর্যন্ত তাড়া করে।

আমরা ভাবি সব বে-ওয়ারিশ কুকুর এক রকম। মোটেই তা নয়। কবি অন্নদাশঙ্কর রায়দের একটা বড় সাইজের কুকুর ছিল, সে একটু ঝগড়াটে স্বভাবের হলেও, সভা-সমিতি করতে খুব ভালোবাসত। একবার এক জায়গায় মাঘোৎসবের উপাসনা হচ্ছে, এমন সময় ঐ কুকুর সবাইকে ঠেলেঠুলে একেবারে বুড়ো আচার্যমশায়ের মুখোমুখি ফরাশের ওপর গিয়ে বসল।

তারপর পাক্কা আড়াই ঘণ্টা গান, উপদেশ, প্রার্থনা শুনে সবাই যখন উঠল, ও-ও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যিস আচার্যমশাই সারাক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন, নইলে চোখ খুলে ছয় ইঞ্চি দূরে ঐ কুকুর-মুখ দেখলেই হয়েছিল আর কি!

নাম-করা শিশু-সাহিত্যিক অজেয় রায়দের বাড়িতে একটা কুকুর থাকত। হঠাৎ তার চটি খাবার শখ চাপল। চটির বাড়ি নয়, চটির ওপর দিকটা। এখানে সবাই বাইরে চটি খুলে ঘরে ঢোকে। ওদের বাড়িতে কেউ এলে, ঘণ্টাখানেক পরে বেরিয়ে এসে

boiRboi.net

দেখত চটির তলা আছে, ওপরটা নেই ! কুকুর ল্যাজ নাড়ছে।

ক্রমে বাড়ির সকলে কুকুরের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠল। বাদে বলাই-মুচি। তাকে দিয়ে ঐ সব হাপ্-খাওয়া চটি সারানো হত। তার কিছু বাড়তি রোজগার হত। সে কুকুরের মাথায় হাত বুলোত, ছিল্‌কেটা বিস্কুটটা খেতে দিত। একদিন কিন্তু তিন জোড়া চটি সারিয়ে পকেটে পয়সা ফেলে, হাসিমুখে বাইরে এসেই কুকুরটাকে গাল দিতে লাগল ! বলাই যতক্ষণ বাড়ির লোকের চটি সারাচ্ছিল, কুকুর ততক্ষণে বলাইয়ের চটির ওপরটা চেটেপুটে সাবাড় করে রেখেছিল !

সাপ

ছোট বেলাকার একটা ঘটনা মনে আছে। শিলং পাহাড়ে থাকতাম। কি বিষ্টি ! কি বিষ্টি ! বাড়ির তিনদিক ঘিরে একটা আধ-মানুষ গভীর নালা কাটা ছিল। তাতে বর্ষায় করুগেটের ছাদ থেকে বিষ্টির জল গড়িয়ে পড়ত। বাগান থেকে বাড়তি জলও এসে মিশত।

দুটো চ্যাপটা পাথর ফেলে তার ওপর একটা পুলের মতো ছিল। সেটার ওপর দিয়ে বারান্দায় উঠতে হত। তখন শিলং-এ বিজলি-বাতি ছিল না। মোমবাতির, তেলের বাতির আলোয় বড় সুখে আমাদের দিন কাটত। এতটুকু অসুবিধা হত না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাবার দুই বন্ধু গল্প-গুজব শেষ করে বাড়ি যাচ্ছেন। ঐ পাথরের পুলের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় অমরকাকাবাবু হাতের লাঠি দিয়ে নিজের গোড়ালি খোঁচাতে লাগলেন।

বাবা বললেন, 'হল কি, মিত্তির ?' কাকাবাবু বললেন, 'পায়ে একটা দড়ি না কি জড়িয়ে গেছে। কিছুতেই খুলতে পারছি না।' এই বলে নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে চেষ্টা করতে যাবেন, বাবা খপ্ করে তাঁর হাত ধরে ফেলে বললেন, 'থামো !' তারপর 'বাতি ! বাতি !' বলে চ্যাঁচাতেই একটা লণ্ঠন এল।

তার আলোয় দেখা গেল কাকাবাবুর পা বেয়ে একটা কালো সাপ উঠবার চেষ্টা করছে ! বাবার হকি-ফুট্‌বল-খেলা পা। সেই পা তুলে ঝপ্ করে সাপের মাথা মাড়িয়ে মাটিতে চেপে ধরলেন। সাপের গা বিশ্রী রকম পাক খেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি-সেটা এল, সাপেরও ভবলীলা সাঙ্গ হল। তারপর তাকে লাঠিতে ঝুলিয়ে বাড়ির

boiRboi.net

চৌহদ্দির বাইরে ফেলে আসা হল।

এর পঞ্চাশ বছর পরে শান্তিনিকেতনে এক দিন আমাদের বারান্দার আলসের ওপর বসে আছি। হঠাৎ দেখি কাক, শালিখ, চড়াই, ঘুঘু, বুলবুলি, সবাই বাগানের মধ্যিখানের ঘাসজমিতে নেমে, মহা নাচানাচি, ডানা ঝাপটানি, কিচিরমিচির লাগিয়েছে!

কি ব্যাপার ভাবছি, এমন সময় ছাদে-বেয়ে-ওঠা বুগানভিলিয়া গাছ থেকে এক হাত লম্বা রামধনু রঙের একটা গিরগিটি থপ্ করে আমার পাশেই পড়ে, সেখানেই পড়ে রইল। মনে হল নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই। কিন্তু বুকটা উঠছে পড়ছে।

মানুষের পাশে গিরগিটি বসে আছে, এ আমি ভাবতেই পারি না। অবাক্ হয়ে ইদিকউদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ কচিকচি ডালপালা ফুলপাতা ভেঙে, আমার ওপর-হাতের মতো মোটা, অন্ততঃ ছয় হাত লম্বা, গাঢ় ছাই রঙের একটা সাপ ঝাপুড়-ঝুপুড় করে নেমে এসে, কাঁকড়ের ওপর দিয়ে কিলবিল করে গিয়ে নিমেষের মধ্যে টগরের বেড়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

মিনিট খানেক গিরগিটি আর আমি পাশাপাশি থুম্ হয়ে বসে থাকার পর, 'মালি! মালি!' বলে মহা চ্যাঁচামেচি লাগালাম। মিনিট পাঁচেক পরে মালি এসে বলল, 'ভয় নেই! ভয় নেই! উনি ধ্যানস্। মাঝে মধ্যে কামড়ান, কিন্তু বেশি বিষ নেই!'

চটে গেলাম। 'বিষ নেই তো পাখিরা নাচছে কেন?' মালি হাসতে লাগল, 'উনি ওদের আন্ডা-বাচ্চা খাবেন বলে গাছে উঠেছিলেন, তাইতেই ওদের রাগ। গিরগিটিও খান।' তারপর হেই! হ্যাশ্হুশ্! করতেই পাখিরা উড়ে গেল। আরো কতক্ষণ পরে গিরগিটিটাও ল্যাজ টানতে টানতে আবার গিয়ে বুগানভিলিয়া গাছে উঠল।

বহু কাল আগের এক গল্প শুনেছি। কুষ্ঠিয়ার কাছে গোরাই নদীর ধারে এক গ্রাম। সেই গ্রামে এক ছোট ছেলে আর তার দিদি তাদের মায়ের কাছে থাকে। বাবা মফঃস্বলে চাকরি করেন। ওদের দেখাশুনো করে একজন আধবুড়ো লোক। তার নাম জমীরদা। কোনো গুণীনের কাছে শেখা, তার অনেক বিদ্যে জানা ছিল। সে সাপের বিষের ওষুধ জানত, সাপ বশ করতে পারত।

দিদির পাখি পোষার শখ। বাগানে একটা চালাঘরে, কাঠের বাক্সে করে দিদি রাজহাঁস পুষত। দিনের বেলায় গোরাই নদীতে সাঁতার কাটত, পুকুড়-পাড়ে গুগ্লী তুলে খেত। রাতে চালাঘরে থাকত। এক দিন ভোরে চালাঘরের দোর খুলেই দিদি দেখে একটা হাঁস মরে পড়ে আছে! অমনি সে কান্না জুড়ল। জমীরদা ছুটে এল। মরা হাঁসকে কোলে করে বাইরে আনতেই অন্য হাঁসরাও হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল।

মরা হাঁসকে পরীক্ষা করে জমীরদা বলল, 'একে সাপে কেটেছে। গোখ্রো সাপ। আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি। তোমরা চালাঘরে ঢুকো না।'

ঘরের শেকল তুলে দিয়ে জমীরদা ওষুধ আনতে গেল। কিছুক্ষণ পরেই এক হাতে একটা মরা মানুষের হাড় আর অন্য হাতে শুকনো শিকড়ের মতো কি যেন

banglainternet.com

নিয়ে সে ফিরে এসেই সবাইকে বলল, 'তফাতে যাও! আমি সাপ বের করি!'

সবাই ভয়ের চোটে পাশের ঘরের দাওয়ায় উঠে দাঁড়াল। জমীরদা রিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে, শিকড়টাকে বাগিয়ে ধরে, চালাঘরে ঢুকে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিছু হেঁটে সে-ও বেরিয়ে এল আর প্রকান্ড এক গোখ্‌রো সাপও গর্জাতে গর্জাতে বেরিয়ে এল!

বাইরে এসেই জমীরদা মরা মানুষের হাড়টা দিয়ে সাপের চারদিক ঘিরে মাটিতে গোল একটা দাগ কেটে দিল। তারপর নিজেও সরে দাঁড়াল।

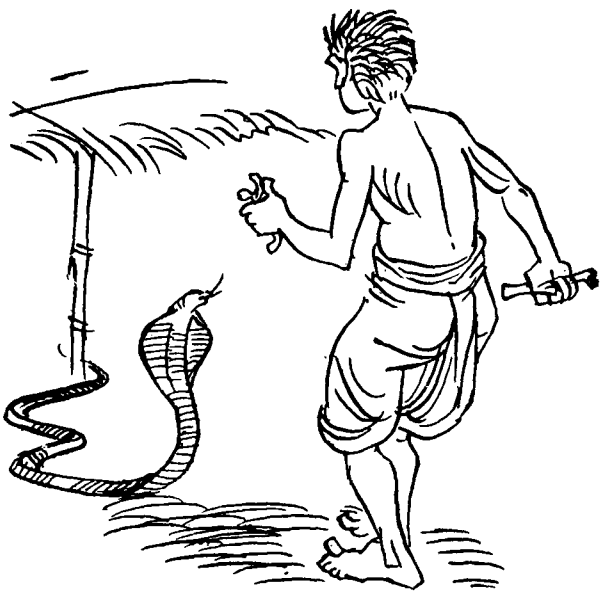

এবার সকলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। ঐ হিংস্র সাপ কিছুতেই দাগের বাইরে বেরুতে পারল না। হিশ্‌-হিশ্‌ করে বারবার তেড়ে আসে, কিন্তু দাগের কাছে পৌঁছে মাথা নুইয়ে আবার ছুটে যায়। আবার তেড়ে আসে। এমনি করতে করতে সাপ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল।

কে যেন বলল, 'লাঠি দিয়ে মেরে ফেলি?' জমীরদা মাথা নাড়ল, 'গুণীনের বারণ আছে। ওর চারদিকে ঘিরে আগুন জ্বালতে হবে।' শুকনো কাঠ-খড় দিয়ে দাগের বাইরে গোল করে আগুন জ্বালানো হল। নিষ্ফল আক্রোশে নিজের গায়ে ছোবল মারতে মারতে সাপটা নিজের বিষে নিজে মরে গেল। শরীরটা ঐ আগুনে

পুড়ল।

বহু কাল পরে ঐ ছেলের কাছে এ গল্প শুনেছি। জমীরদা অনেক সাপে-কাটা লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কিন্তু বিদ্যেটা কাউকে শিখিয়ে যায়নি, গুণীনের নাকি বারণ ছিল। বেশি দেরি করে ফেললে ওষুধের ফল হয় না, এ-কথাও সে বলত।

হুদিনি ইত্যাদি

ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল, ভেল্‌কি। সবই এক ; অর্থাৎ নয়কে হয় করা। অন্ততঃ অভিধানে তাই বলে। আসলে তফাৎ আছে। একটি হল চোখকে ফাঁকি দেওয়া ; হাত-সাফাইয়ের কারচুপি দিয়ে দর্শককে বোকা বানানো। খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিদ্যুতের মতো হাত চাই, দর্শকের মনকে মুঠোর মধ্যে রাখতে পারা চাই।

যেমন অনেক বছর আগে নিউ এম্পায়ারের মঞ্চে দেখেছিলাম, সোয়ারসুদ্ধ একটা মরিস্ গাড়ি তোলা হল। পেছনে একটা পরদা ঝুলছিল ; যদ্দুর মনে পড়ে, তাতে একটা পেট্রল-স্টেশনের দৃশ্য আঁকা ছিল।

ফট্ করে জাদুকর পি সি সরকার ফাঁকা পিস্তলের আওয়াজ করলেন, সবাই চমকে উঠলাম। তারপরেই চেয়ে দেখলাম মঞ্চের ওপর পেট্রল-স্টেশনের দৃশ্য আঁকা পরদাটা রয়েছে, কিন্তু সোয়ারসুদ্ধ গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হতভম্ব হয়ে গেছিলাম।

পরে ভেবে দেখেছি হাত-সাফাই দিয়ে এটা সম্ভব হতে পারে। ধরুন যদি গাড়ির ঠিক সামনে, মাথার ওপর অদৃশ্যভাবে অবিকল ঐ রকম আরেকটা পরদা গুটিয়ে রাখা হয় আর পিস্তলের শব্দে চমকে-ওঠা দর্শকদের এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে, ঝুপ্ করে গুটনো পরদাটিকে গাড়ির সামনে নামিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পিস্তলের ধোঁয়া পরিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে পরদা আছে, গাড়ি নেই। তাই করা হয়েছিল কি না জানি না, তবে ব্যাখ্যানা হতেও পারে।

আরেক রকম দেখেছি তাকে হাত-সাফাই বলা যায় না। তার কোনো ব্যাখ্যানই হয় না। ৫০ বছর আগে সুরুল গ্রামের মাঠে সারকাসের তাঁবু পড়েছিল। শান্তি-নিকেতন থেকে আমরা দল বেঁধে গিয়ে, চার আনা করে টিকিট কিনে, ছেঁড়া তাঁবুর তলায়, রিংএর ধারে কাঠের বেঞ্চিতে বসলাম।

তখন বিজলি-বাতি ছিল না এদিকে। ছাদ থেকে মস্ত একটা হ্যাজাক্ ঝোলানো ছিল। মালিক দু-জন ; আর্টিস্ট জনা দশেক ; কয়েকটা ঘেমো কুকুর, রোগা ঘোড়া আর একটা বেয়াদব চাকর। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে, গোড়াতেই বড় মালিক বলল, 'এই লোকটা বেজায় বদ্, পারলে খেলা নষ্ট করে দেবে। তার চেয়ে এটাকে পুঁতে রাখা যাক! অ্যাই, গর্ত খোঁড়্!'

ছোট মালিক বলল, 'দাঁড়াও, আগে ও হ্যাজাক্টা ঝোলাক, তারপর পোঁতা যাবে। নইলে তুমি আমাকে বাতি ঝোলাতে বলবে?'

বাতিটা ঠিকমতো ঝোলানো হল, চাকরটার সাহায্যে গর্তও খোঁড়া হল। দর্শকরা অনেকে উঠে গিয়ে ভালো করে দেখে এল গর্তে কেউ বা কিছু নেই। তারপর চাকরটাকে গর্তে পুরে, মাটি-চাপা দিয়ে, পা দিয়ে বেশ করে চেপেচুপে মাটি শক্ত করে, তার ওপর দেড় ঘণ্টা খেলা দেখানো হল।

প্রায় সবই অতি মামুলী খেলা, তার জন্যে একটা লোককে জ্যান্ত পোঁতার কোনো দরকার ছিল মনে হল না। বিরক্ত হয়ে উঠে যাবার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় শেষ খেলার ঘোষণা শুনতে পেলাম।

বড় মালিক বলল, 'জিন্দা পুতুলের নাচ দেখাব। কিন্তু আমরা গরীব মানুষ, তাঁবুতে তালি দেবার পয়সা পর্যন্ত জোটাতে পারি না। জিন্দা পুতুল কিনব কি করে? তাই নিজেরাই বানিয়ে নিচ্ছি।'

এই বলে দু-জনে নিজেদের পকেট থেকে দুটি ময়লা রুমাল বের করে, ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখাল। দর্শকরা কেউ কেউ হাতে নিয়ে দেখল কোনো কারচুপি নেই, কিন্তু জঘন্য নোংরা।

রুমাল দুটি হাতে ফিরে আসতে, বড় মালিক একেকটাতে ছয়টি গিঁট দিয়ে মুণ্ডু, কোমর, দুই হাত, দুই পা বানিয়ে, আবার রুমাল-পুতুল সবাইকে দেখাল। তারপর হাতের তেলোয় তাদের পাশাপাশি শুইয়ে বলল, 'মরা পুতুল তো আর নাচতে পারে না, তাই জ্যান্ত করে নিচ্ছি।' এই বলে দুটো ফুঁ দিতেই, পুতুল দুটো লাফিয়ে উঠে হাত তুলে সেলাম করে, এ-ওর কোমর জড়িয়ে মালিকের হাতের তেলোয় নাচতে লাগল। নাচতে নাচতে এক সময় তিড়িং-বিড়িং করে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। নেমে হাত তুলে ঠ্যাং ছুঁড়ে কত রকম নাচ যে দেখাল, তার ঠিক নেই। আমরা একেবারে থ'! কোথাও কোনো সুতোটুতো বাঁধা দেখা গেল না। মালিকরা হাত-ও নাড়ছিল না।

তবে ছোট মালিক ভুলে একটাকে মাড়িয়ে দেওয়াতে তার রাগ দেখে কে! ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে গিয়ে, ধাঁই ধাঁই করে বেশ ক-টা লাথি কষে দিল। অন্যটা সেই সুযোগে বেচারা ছোট মালিকের পা বেয়ে উঠতে লাগল।

তখন বড় মালিক চটে গেল। 'ঢের হয়েছে, আর না! তোদের দেখছি বড্ড বাড় বেড়েছে!' এই বলে দুটোকে আবার হাতে তুলে নিল। তখনো তাদের তেজ কমেনি।

boiRboi.net

সমানে লাফাচ্ছে আর ঘুঁষি দেখাচ্ছে। মালিক জোরে একটা ফুঁ দিতেই কিন্তু তারা নেতিয়ে শুয়ে পড়ল। মালিক আমাদের কাছে এসে পুতুল দেখাল। হাতে তুলে দেখলাম রুমালে গিঁট বেঁধে তৈরি দুটি পুতুল। কল-কব্জা কিছু নেই!

আমাদের চোখের সামনে তাদের গিঁট খুলে, ঝেড়ে, পকেটে পোরা হল। খেলা-শেষের ঘণ্টি পড়ল। সবাই উঠে যাচ্ছিল, এমন সময় বড় মালিক বলল, 'চাকরটা তো মাটির নিচে! আরে, সে না থাকলে, এত সরঞ্জাম তুলে রাখবে কে?' এই বলে দুই মালিক কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে, তাকে আবার বের করল।

লোকটা ঢুলু-ঢুলু চোখে চারদিকে তাকিয়ে, গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে, গর্তটা আবার বুজিয়ে দিল। তারপর হ্যাজাকের দড়ি খুলতে লেগে গেল! আমাদের মুখে কথা নেই। আজ পর্যন্ত এর কোনো ব্যাখ্যানা খুঁজে পাইনি।

আমেরিকায় আমার স্বামী বিখ্যাত ভেল্‌কিবাজ হুদিনির খেলা দেখেছিলেন। সে বড় আশ্চর্য ব্যাপার। সেদিন হুদিনি বলেছিলেন তিনি নাকি ভারতে এসে এক সাধুর কাছে যোগ শিখেছিলেন। তাঁর সব আশ্চর্য খেলার কিছুটা হাত-সাফাই হলেও,

ভালো রহস্যগুলিতে তিনি যোগবল প্রয়োগ করেন। সে ব্যাপার-ই আলাদা।

এর পর তিনি তাঁর বিখ্যাত বাক্স-রহস্য দেখিয়েছিলেন। মঞ্চের মধ্যিখানে বারোটা উজ্জ্বল আলোর নিচে, বস্টন শহরের নাম-করা কারিগররা, দর্শকদের সামনে বসে, বড় বড় তক্তা আর ছয় ইঞ্চি আট ইঞ্চি লোহার স্ক্রু দিয়ে মস্ত বড় এক বাক্স তৈরি করল। তার সব উপকরণ এক নাম-করা কোম্পানি সরবরাহ করেছিল।

বাক্সের যে-দিকটি দর্শকদের দিকে ফেরানো ছিল, তাতে দুটো ছ্যাঁদা করা হল। বোধ হয় বাতাস যাবার জন্য। তারপর পুরো দস্তুর ডিনার স্যুট পরে হুদিনি ঐ বাক্সে ঢুকলেন। বাক্সের ঢাকনি বন্ধ করে লম্বা লম্বা স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেওয়া হল।

বাক্স চাদর দিয়ে ঢাকা হল না। উজ্জ্বল আলোর নিচে, মঞ্চের ওপর এমনি পড়ে রইল। গোড়ার দিকে সেই দুটো ছ্যাঁদা দিয়ে হুদিনি আঙুল বের করে দেখাচ্ছিলেন, যে তিনি ভিতরেই আছেন। তারপর তাও বন্ধ হল। ঘর ভরতি শত শত দর্শক নিশ্বাস বন্ধ করে, বাক্সের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে রইল।

হয়তো আধ ঘণ্টা সময় কেটেছিল। মনে হচ্ছিল এক যুগ। অনেকে ভাবছিল বাহাদুরি করতে গিয়ে শেষটায় লোকটা মরে-টরে গেল না তো! হঠাৎ দেখা গেল বাক্সের পাশে হুদিনি দাঁড়িয়ে!! ঘর্মাক্ত কলেবর, উস্কোখুস্কো চুল। যেন বড় বেশি পরিশ্রম করে এসেছেন। বাক্স যেমন-কে-তেমন।

সেটাকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে খুলতেই মিনিট ১৫ লেগেছিল। দেখা গেল। ভিতরে শুধু হুদিনির রুমালটা পড়ে আছে! বাক্স হুদিনির লোকরা করেনি। তার চার পাশ, তলা বা ওপর, কিছুই খোলা যেত না। তাহলে লোকটা বেরুল কি করে? যোগবলে কি?

ভালোবাসা

বড়ো হয়ে গেলাম কিন্তু ভালোবাসার মাথামুণ্ডু আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না। আমাদের সেকেলে গিন্নিরা শুনেছি স্বামী ছাড়া কিছু জানেন না। এটা যে খুব প্রশংসনীয় কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বিশেষ করে যা মেজাজ একেকটা স্বামীর আর যা চেহারা! এখনকার চেহারা বিয়ের সময়ে কল্পনা করতে পারলে দেখা যেত কে কাকে কতখানি ভালোবাসে। হ্যাঁঃ।

তবে ঐ যা বলছিলাম, বিয়ে দিয়েই যদি ভালোবাসার বিচার করতে হয়, বিশেষতঃ যে-সব ক্ষেত্রে নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করেছে, তবে বলিহারি, বাপু! প্রথম কথা হল গোড়াতেই যে কি দেখে কে কাকে ভালোবেসে ফেলে, তাই বোঝা দায়।

বছর চল্লিশ আগে আর-জি-কর হাসপাতালে আমার গলব্লাডার অপারেশন হয়েছিল। আমার জন্যে রসময়ী বলে একজন দাইকে রাখা হয়েছিল। কাজকর্মে অতিশয় পটু আর তার চেয়েও বড় কথা, উদয়াস্ত নানা রসের কথা বলে আমাকে খুশি রাখত।

দেখতে ভালো না। মোটা, বেঁটে, কালো, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট। কিন্তু সবটার ওপরে এমন একটা সস্নেহ অমায়িক ভাব যে আমার তাকে বড্ড ভালো লাগত। ও সধবা কি বিধবা ঠাওর হত না। পরনে সরু পাড় ধুতি, খালি হাত, গলায় সোনার বিছে হার, কানে সোনার মাকড়ি।

সেকালের পক্ষে ভালো রোজগার ছিল। মাসে শ-দুই তো হবেই। বলেছিল ভাইপোর বাড়িতে পয়সা দিয়ে থাকে। বৌ খুব যত্ন করে। রাতে পায়ে তেল মালিশ করে দেয়। দেবে না-ই বা কেন? পিসি মলে ওরাই সব পাবে। চটালে শেষটা কি হতে কি হয়ে যাবে কে জানে!

এক দিন রসময়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার স্বামী নেই?' রসময়ী আকাশ থেকে পড়ল। 'নেই মানে? আছেই তো! খুব বেশি করেই আছে। আমাকে পছন্দ হয়নি বলে আরেকটা বে করে, নারকেলডাঙার ওদিকে খোলার ঘর তুলে রয়েছে।

পাশে একটা দো-তলা বাড়ি। সেখানে আমার সই গেছল। অনেক দিন থেকে সেই মেয়ে মানুষটাকে দেখার বড় শখ ছিল। কত বড় সুন্দরী সে! কি বলব দিদি, দেখে আমি হাঁ হয়ে গেনু! এ কি তাজ্জব ব্যাপার! এই লম্বা হট্‌কা শিড়িঙে চেহারা, কুচকুচে কালো, উট-কপালী, উঁচু দাঁত, মাথার সামনে টাক! বলিহারি পুরুষ-মানুষের পছন্দ। ওকে নিয়ে সুখে থাক্। আমার কোনো আপত্তি নেই!'

এই বলে আমার চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে, দুম দুম করে রসময়ী চলে গেল।

মাঝে মাঝে মধুপুরে গিয়ে আমার ভাসুরদের বাড়িতে কিছু দিন কাটিয়ে আসতাম। পুজো থেকে দোল পর্যন্ত বড় চমৎকার সময় সেখানে। ওঁরা ছুটি কাটাতে যেতেন, অন্য সময় বাড়ি খালিই পড়ে থাকত ; মালিরা দেখাশুনো করত।

আমার বড়-জা কেবলি বলতেন, 'মালিদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিস্। ছোটনা, বুধুয়া, পাঁচু—এরা লোক ভালো, কিন্তু বেজায় কুঁড়ে। তবে ওদের বৌরা ভালো। বিশেষ করে পাঁচুর বৌ লখিয়া।'

বাস্তবিকই তাই। সে যে না বলতেই আমার কত কাজ করে দিয়ে যেত, তার ঠিক নেই। আমারো বয়স তখন কম ছিল, গিন্নিপনায় আনাড়ি ছিলাম। লখিয়া আমাব সমবয়সী বন্ধুর মতো ছিল। সারি সারি গুদোমঘরে দু-তিন বাড়ির মালিরা পরিবার নিয়ে থাকত। বুধুয়া ছিল সবার বুড়ো। বয়স ষাটের কাছাকাছি, চুল পাকা, শরীরটাও

boiRboi.net

পাকানো দড়ির মতো।

একবার আমি গিয়ে পেঁছতেই, বড়দিদি বললেন, 'আমরা কাল চলে যাচ্ছি, তুই খুব সাবধানে থাকিস্। আর ঐ বদ্ মেয়েমানুষ লখিয়াটাকে ঘরে ঢুকতে দিবি না।' আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 'কেন, বড়দি?'

বড়দিদি হাঁড়িমুখে বললেন, 'সে তোর শুনে কাজ নেই।' 'বলুন না কি ব্যাপার।' বড়দিদি বললেন, 'কি আবার ব্যাপার! পাঁচুকে ছেড়ে, বুধুয়ার সঙ্গে ঘর করছে।'

শুনে আমি আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলাম! বুধুয়ার অন্যান্য গুণের ওপর, সে পাঁচুর আপন জ্যাঠামশাই! আর পাঁচু দেখতে কি ভালো! সে যাই হোক, বড়-দিদিরা তো চলে গেলেন। একটু পরেই দেখি লখিয়া বাড়ির বাইরে ঘুর-ঘুর করছে। আমি বেরিয়ে আসতেই বলল, 'বাসনগুলো মেজে দিয়ে যাই, কাকিমা?'

আমি বললাম, 'বড়-মা তোকে ঘরে ঢুকতে দিতে মানা করে গেছেন। এটা কি করলি লখিয়া? বুড়োর ষাট বছর বয়স, চিমড়ে চেহারা, ঐ বদ্‌রাগী! আর পাঁচু কি সুন্দর, কি ঠান্ডা মেজাজ। তাছাড়া বুড়ো তোর জ্যাঠ-শ্বশুর হয় না?'

লখিয়া বুক ফুলিয়ে, ঘাড় উঁচু করে, সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তা কি করব, উনার সঙ্গে ভালোবাসা হয়ে গেল যে!' যেন এ বিষয়ে আর কোনো কথাই হতে পারে না। তারপর দাপিয়ে চলে গেল। আর ওকে দেখিনি।

আমাদের এক পাতানো ছোট-ঠাকুমা ছিলেন, তাঁর বেলা ঠিক এর উল্টো দেখলাম। ঠাকুমা দেখতে কি ভালো, কিন্তু ঠাকুরদা! হাজার গুণী হলেও বেঁটে মোটা, বেজায়

পেটুক, নিজের বিষয়ে বড় বড় কথা বলতেন, খিটখিটে, খুঁৎখুঁতে। কিন্তু সবাই বলত ওঁরা আদর্শ স্বামী-স্ত্রী। বিয়ের আগে পরস্পরকে একটিবার দেখেই সেই যে ভালোবেসে ফেলেছিলেন, তারপর ৫২ বছরেও সেই ভালোবাসায় এতটুকু ছেদ পড়েনি। গুণ দেখেই নাকি ঠাকুমা মুগ্ধ হয়েছিলেন, কন্দর্প-কান্তি নিয়ে কি ধুয়ে খেতেন?

ঐ তো ছোট শরিকদের রাঙা পিসেমশাইটি আছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর রূপ দেখে তাঁকে নাটকে পার্ট দিতেন। অথচ সারা জীবন রাঙাপিসিকে কি কম জ্বালিয়েছেন! ভালোবাসা আলাদা জিনিস। টাকাকড়ি রূপ—এসব তুচ্ছ জিনিসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

একবার ছোট-ঠাকুমাকে চেপে ধরা হয়েছিল। পাকা আমটির মতো মানুষটি ফিক্‌ফিক্‌ করে হেসে বললেন, 'সে এক ব্যাপার, ভাই! চিড়িয়াখানায় দেখা হল। আমি এনট্রান্স পাস করেছি, উনি নতুন ডেপুটি হয়েছেন। সামনাসামনি বসিয়ে "খুকু একটা কবিতা বল তো" তো আর চলে না।

ঐ যে বড় পুকুরে কালো হাঁস ভাসে, তারি পাশে আমরা চার বোন মা-মাসিদের সঙ্গে বসে গল্প করতে লাগলাম। আর ওনারা পাঁচ বন্ধু পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, নিজেদের মধ্যে যেন কতই অন্যমনস্ক ভাবে কথা বলতে বলতে।

ওরি মধ্যে চারি চক্ষুর মিলন হল, সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ-ও হয়ে গেল। কপাল ঘেমে গেল। বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। আমি মা-র কাছে মত দিয়ে ফেললাম। এক মাসের মধ্যে বিয়ে-ও হয়ে গেল। সেই ইস্তক পরম সুখে আছি। তবে কি জানিস্—' এই বলে ছোট-ঠাকুমা উঠে পড়লেন।

আমরা ছাড়ব কেন! 'না, তোমাকে বলতেই হবে—তবে কি জানিস্ মানে কি?'

ছোট-ঠাকুমার ফরসা গাল লাল হয়ে উঠল, 'সত্যি কথা বলতে কি জানিস্, আমি আসলে ওঁকে চিনতে পারিনি। ওঁর বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁকেই পছন্দ করে ফেলেছিলাম। তা এই বা মন্দ কি? ৫২ বছর কেমন সুখে—খুব একটা শান্তিতে না হলেও—কাটিয়ে তো দিলাম। এর বেশি কি আশা করতে পারতাম?'

ঐ যে গোড়ায় বলেছিলাম ভালোবাসার কথা আর বলবেন না।

boiRboi.net

পূর্ণদার মাছ

এ গল্প আমাদের বন্ধু শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী শিশু-সাহিত্যিক শিশিরকুমার মজুমদারকে বলেছিলেন। অনেক দিন আগের কথা। এক দিন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকানে হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারু রায়, নরেন দেব আর পূর্ণদা একসঙ্গে জুটেছেন।

মাছধরার বিষয়ে নানান্ রসের গল্প হচ্ছে। এমন সময় দুটো বড় বড় ওয়েলার ঘোড়ায় টানা একটা জুড়ি-গাড়ি দোকানের সামনে থামল। এ-গাড়িকে সেকালে লোকে ব্রুহাম বলত, খুব বড়লোকি ব্যাপার।

ব্রুহাম থেকে যিনি নামলেন তাঁর নাম জানে না, এমন লোক সেকালে কম ছিল। ইনি হলেন শ্যামপুকুর স্ট্রীটের কুমারকৃষ্ণ মিত্র। একজন নামকরা বড়লোক। কলকাতায় এবং তার আশেপাশে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি, বাগান, ইত্যাদির মালিক। মানুষটিও ভারি অমায়িক আর অতিথিবৎসল।

যে-কারণেই তিনি সেদিন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এসে থাকুন না কেন, মাছ-ধরার গল্প শুনে মুগ্ধ হলেন। শুধু মুগ্ধই হলেন না, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাইকে পরের রবিবার ওঁর দমদমের বাগান-বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসলেন।

সারা দিনের ওয়াস্তা। সকাল থেকে মাছ-ধরা, দুপুরে ভূরি ভোজন, বিকেলে ইচ্ছে হলে আবার মাছ ধরা, বাগানে ভ্রমণ, সংগৃহীত মূর্তি-ছবি দর্শন, যতক্ষণ খুসি থাকুন। একেবারে ঢালাও ব্যবস্থা।

তারপর একটু বিনীত ভাবে কুমারকৃষ্ণ বললেন, 'আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি হয়ে যাবেন। আপনাদের আপ্যায়নের জন্য নিখুঁৎ ব্যবস্থা করা থাকবে। যা থাকবে না, তা-ও চাইবামাত্র পেয়ে যাবেন। আমার ম্যানেজার, গোমস্তা, বেয়ারা, দারোয়ান, বামুনঠাকুর, সবাই হাজির থাকবে।

'শুধু আমি থাকতে পারব না। একটা বিশেষ জরুরী কাজে আমাকে মফঃস্বলে যেতে হবে। কিন্তু এই সামান্য কারণে যদি আপনারা আমার সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন, তাহলে আমি মর্মাহত হব।'

অবিশ্যি গ্রহণ না করার কোনো কথাই ওঠেনি। অন্যান্য নেশাখোরদের মতো মাছুড়েরাও ভারি উদার হয়। অত আত্মসম্মানের ধার-ধারে না। তাছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থাও নিশ্চয় নিতান্ত মন্দ হবে না। আর অচেনা উৎসাহী গৃহস্থরা মাছ-ধরার পক্ষে খুব সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। কাজেই আনন্দের সঙ্গে তিনজন রাজি হয়ে গেলেন।

boiRboi.net

রবিবার সকালে সকলে সেই বিখ্যাত বাগানবাড়িতে পৌঁছতেই সাদর অভ্যর্থনা পেলেন। ম্যানেজার গোমস্তা ইত্যাদি ওঁদের সমাদর করে বিশাল পুকুরের ধারে নিয়ে গেলেন। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সব হয়ে গেলে, দুপুরের খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

পূর্ণদা শিল্পী মানুষ, মাছ ধরার রোমাঞ্চ উপভোগ করলেও, নিজে মাছ-ফাছ ধরতেন না। তিনি ঘুরে ঘুরে বাগানের গাছ-গাছড়া, শ্বেত-পাথরের মূর্তি ইত্যাদি দেখতে লাগলেন। বাকি তিনজন সঙ্গে করে মাছ-ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম এনেছিলেন। তাঁরা জায়গা বেছে, যে যার টোপ, চার, ছিপ, বঁড়শী, ফাৎনা নিয়ে গুছিয়ে বসে গেলেন। পুকুরে বড় বড় মাছকে ঘাই দিতে দেখা যেতে লাগল।

সময় কাটতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, কারো ছিপে মাছ পড়ল না। ম্যানেজার-বাবু খানিকক্ষণ পর পর, একবার এসে নিঃশব্দে দেখে যেতে লাগলেন। মাছ ধরতে গিয়ে ধৈর্য হারালে চলে না। ওঁরা বসে আছেন তো বসেই আছেন। পূর্ণদার মনে হতে লাগল বোধ হয় খাওয়ার সময় হতে আর বেশি দেরি নেই।

ঠিক সেই সময় পুকুরপাড় থেকে একটা চাপা উল্লাস শোনা গেল। পূর্ণদা দৌড়ে গিয়ে দেখেন হেমেন্দ্রকুমারের টোপ গিলেছে মনে হচ্ছে ইয়া বড়া মাছ।

তারপর যে খেল্ শুরু হল, সে এক দেখবার জিনিস। মাছের সঙ্গে মাছুড়ের লড়াই। এ-ও ছাড়ে না, ও-ও ছাড়ে না। ম্যানেজারবাবু গোমস্তা ইত্যাদি ছুটে এসে নিশ্বাস বন্ধ করে খেল্ দেখতে লাগলেন। হেমেন্দ্রকুমার কখনো সুতো ছাড়েন, কখনো মাছকে খেলিয়ে কাছে আনেন। সে ব্যাটাও যত রকম কসরৎ জানত, সব দেখাতে লাগল। এমনি করে প্রায় দু-ঘণ্টা খেলিয়ে খেলিয়ে মাছকে ঘায়েল করে আনলেন।

বন্ধুদের এতক্ষণে প্রায় দম বন্ধ হবার জোগাড়। জাত-মাছুড়েদের নিয়ম, না ডাকলে একজনের মাছে আরেকজন হাত লাগাবে না। আর হেমেন্দ্রকুমার সাহায্য চাইবার ছেলেই ছিলেন না। অগত্যা যখন মাছ সত্যি সত্যি ডাঙায় পড়ে খাবি খেতে লাগল, তখন দেখা গেল ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবু আর গোমস্তা গিয়ে লোকজন ডেকে এনেছেন।

তারা মাপবার ফিতে, পেল্লায় এক দাঁড়িপাল্লা, খাতা, পেন্সিল নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। হেমেন্দ্রকুমার ছিপ ছেড়ে দিলেন। বঁড়শী তখনো মাছের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবুর লোকরা মাছের লম্বা আর বেড় মাপতে লেগে গেল। লম্বা চার ফুট, বেড় ছত্রিশ ইঞ্চি। তারপর মাছকে দাঁড়িপাল্লায় তোলা হল। ওজন সাড়ে বারো সের। সব কিছু খাতায় লেখা হল।

এদিকে মাছের গায়ে হাত দেবার জন্য, বন্ধুদের হাত নিশপিশ করছিল। গোমস্তা সযত্নে বঁড়শী খুলে ফেললেন। তখন সকলের খেয়াল হল যে মাছের নাকে একটা পেতলের নথ্ পরানো হয়ে গেছে। তাতে খুদে একটা পেতলের টিকিট ঝুলছে। গোমস্তা ডেকে বললেন, ৭৩ নং। সংখ্যাটি খাতায় লেখা হল।

boiRboi.net

সঙ্গে সঙ্গে কেউ কিছু বুঝবার আগেই, মাছটাকে ঠেলে ঝুপ্ করে আবার জলে ফেলে দেওয়া হল। মাছুড়েদের চক্ষুস্থির! এত কষ্টের মাছ গো!!

ইদিকে ম্যানেজার মণি-ব্যাগ খুলে বললেন, সাড়ে বারোক্কে ছয় আনা হল গিয়ে ছয় বারোং বাহাত্তর আর তিন। এই ধরুন চার টাকা এগারো আনা। বাড়ি যাবার পথে ভালো দেখে একটা কিনে নিয়ে যাবেন, কেমন?'

তারপর চার বন্ধুর বজ্রাহত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আরে ছি! ছি! কর্তা-মশাই বোধ হয় বলতে ভুলে গেছিলেন যে আমাদের এখানকার নিয়ম যে মাছ ধরা হবে, কিন্তু মারা হবে না। আনন্দটা তো ধরাতেই, মারাতে তো আর নয়। আমরা এই খাতায় মাছদের নম্বর দেখে, ওদের বাড়ের একটা হিসাব পাই। এবার চলুন, খাবার তৈরি।'

না, ওঁরা রেগেমেগে না খেয়ে চলে যাননি। গেলে ভুল করতেন। মখমলের আসনে বসিয়ে, শ্বেত পাথরের থালা বাটিতে ষোল বেহ্মুনে খাইয়েছিল। তারপর দই, রাবড়ি, সন্দেশ। শুধু বোকারাই রেগেমেগে না খেয়ে বাড়ি যায়।

boiRboi.net

দাদামশাই ও স্বেন হেদিন

ভ্রমণকাহিনীর কথাই ধরা যাক। সত্যি কথা, অথচ ভূতের গল্পের মতো লোম খাড়া করে দেয়। কেউ কেউ বানিয়ে কিম্বা বাড়িয়ে লেখেন, কিন্তু তার চেয়েও রোমাঞ্চকর যে ভ্রমণকাহিনী একেবারে আনকোরা বাস্তব। আমাদের বন্ধু শ্রীউমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেমন হিমালয় ভ্রমণ লেখেন, শ্রীমতী সবিতা ঘোষ যেমন বিদেশ ভ্রমণ লেখেন। সেকালেও এই রকম খাঁটি ভ্রমণকারীদের আত্মকথা পত্রিকাতে, বইতে বেরোত। তাঁদের একজন স্বেন হেদিন।

সুইডেনে বাড়ি, ছোটবেলা থেকে মধ্য-ইয়োরোপ, মধ্য-এশিয়া ভ্রমণের শখ। তখন পর্যন্ত যে-সমস্ত অজ্ঞাত নির্জন দেশ হিমালয়ের উত্তরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত, সেই সব জায়গায়, অনুমতি নিয়ে কিম্বা বিনা অনুমতিতে, প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাকলামাকান, তিব্বত, মানস-সরোবর, কৈলাস-পর্বত যাবার অনুমতি পাওয়া লাল-মুখো সাহেবের পক্ষে বড় শক্ত ছিল। তবু যেতেন। বারেবারে যেতেন। ফিরে এসে বই লিখতেন, ছবিটবি দিয়ে। সেকালে ক্যামেরা অত সহজলভ্য ছিল না, তাই নিজের হাতে চমৎকার ছবি এঁকে নিতেন। বইতে সেই ছবি-ও থাকত।

ভারি রসিক ছিলেন। রসবোধ না থাকলে কেউ অজ্ঞাত বিপজ্জনক কণ্টকর পথে পা দিয়ে আনন্দ পায়? খরচপত্র ছিল। সরকারি সাহায্য জোগাড় করতেন। মধ্য-এশিয়ায় পৌঁছে, অনেক সময় বোগদাদে আস্তানা গাড়তেন। হারুণ-অল-রশিদের কথিত রাজধানী বোগদাদ। ইয়োরোপের লোক সেই জায়গাটাকেই সুদূরের সীমান্ত বলে মনে করে। আর তাঁর যাত্রা শুরু হত সেখান থেকে। একেকবার ভারবাহী ঘোড়া, খচ্চর, মজুর, গাইড্, দোভাষী, রসদ সংগ্রহ করতেই এক বছরের ওপর কেটে যেত। স্থানীয় ভাষা টাকা চলনসই গোছের শিখে নিতেন। আমীর-ওমরাহ থেকে ফকির, মুশাফিরদের সকলের সঙ্গে চেনা হয়ে যেত। দেশ থেকে বেশি সঙ্গী-সাথী আনতেন না, কারণ রওনা হবার আগেই তাদের দেশের জন্য মন-কেমন করতে শুরু করত।

একবার বোগদাদে ঐ রকম অনেক দিন ধরে তোড়জোড় চলছে। এমন সময় এক মুশাফির এসে কিছু সাহায্য চাইল। তাকে বিদায় করবার জন্য যৎসামান্য দেওয়া হল। তাতে সে মোটেই খুশি হল না। উল্টে বলল, 'কি! আমি পৃথিবীর যে কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকে লাইনের পর লাইন মুখস্থ বলতে পারি আর আমাকে কি না এই সামান্য বিদায় দেওয়া!'

এ কথা শুনে স্বেন হেদিনের ভারি মজা লাগল। তিনি বললেন, 'তাই নাকি? আচ্ছা বল তো দেখি, আমার দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকে দশ লাইন।' বলবামাত্র লোকটা

নিখুঁত উচ্চারণে গড়গড় করে সুইডেনের বিখ্যাত প্রাচীন কাব্য থেকে দশ-বারো লাইন আউড়ে গেল। স্বেন হেদিনের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিনি তাকে আরো অনেকগুলো টাকা দিয়ে ফেললেন।

তখন লোকটা বলল, 'নাঃ, আপনাকে বেশিক্ষণ এ রকম ধাঁধার মধ্যে ফেলে রাখা কর্তব্য হবে না।' এই বলে এক টানে চুল দাড়ি গোঁপ খুলে ফেলে দিল। ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল স্বেন হেদিনের পুরনো বন্ধু, সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের এশীয় ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপক! মাঝে মাঝে এই রকম মজা হত বলেই, স্বেন হেদিন ঐ রকম অমানুষিক কষ্ট সইবার মনের জোর পেতেন।

যে সময়ে স্বেন হেদিন মানস-সরোবর দেখতে গেছিলেন, আমার দাদামশাই, রামানন্দস্বামীও তার কাছাকাছি সময়ে কৈলাস-পর্বত, মানস-সরোবরে গেছিলেন। তফাৎ ছিল এই যে সাহেব গেছিলেন জ্ঞান আহরণ করতে, দাদামশাই গেছিলেন তীর্থ করতে। অবিশ্যি ভ্রমণের নেশা দুজনারি সমান ছিল।

দাদামশাই সন্ন্যাসী মানুষ, ষাটের ওপর বয়স। দিব্যি সুন্দর পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে নিয়ে, দেরাদুন থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে রসদ নেননি। সন্ন্যাসীরা কখনো ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে পথ চলেন না। পথের

boiRboi.net

দরকার পথ থেকেই জুটে যায়।

দাদামশাই নিয়েছিলেন একটা কম্বল, একটা কাঠের বাটি, একটা মোটা লাঠি। দেরাদুন থেকে যোগী মঠ, সেখান থেকে কৈলাসের রাস্তা। ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রওনা। দু-জন সেবক সঙ্গে গেল। একজনের ঐ অঞ্চলেই বাড়ি। তিব্বতী ভাষা ভালো জানত। ঐ পথে ঐ রকম একজন সঙ্গে না থাকলে চলে না।

সেই বরফ-জমা অঞ্চলে পায়ে হেঁটে পথ চলা বড়ই কষ্টকর। থেকে-থেকেই গুহা-গহ্বর। অনেক সময়ই তার কাছে একটা গরম জলের উৎস। যেন ভগবানই তীর্থ-যাত্রীদের জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

সেকালে দু-জাতের লোক তিব্বত যেত, ব্যবসাদাররা আর তীর্থযাত্রীরা। সবাই গুহায় রাত কাটাত, গরম-জলের উৎসে গা ধুত। জাতের বালাই কি অমন জায়গায় টেকে?

পথে গন্ধমাদন পর্বত দেখেছিলেন, ম্যাপে নিশ্চয় তার অন্য নাম। পাহাড়ে নানা রকম ওষুধের গাছ আছে। রাতে দাদামশাই পাহাড়ে আলো জ্বলতে দেখেছিলেন। ওখানে নাকি কেউ থাকে না। কিসের আলো কে জানে।

নিতি গিরিপথের কাছেই হোতি গিরিপথ। তাদেরো অন্য নাম আছে। সেই পথ দিয়ে গেছিলেন। নিতি হল গিয়ে ইংরেজ-শাসিত ভারত থেকে স্বাধীন তিব্বত দেশের মধ্যিখানের প্রবেশ পথ।

এইখানে একটু গোলমাল দেখা দিল। এর আগে অবধি সাধু-সন্ন্যাসীরা ও-পথে গেলে কেউ বাধা দিত না। তবে সাহেবদের ঢুকতে দেওয়া হত না। এদিকে লাসা অঞ্চলের মানচিত্র করবার জন্যে মাপ-যোক করতে লোক পাঠানো দরকার। শেষ পর্যন্ত এ-দেশী লোকদের সাধু সাজিয়ে লাসা পাঠানো হয়েছিল। সে-কথা জানাজানি হতে কতক্ষণ!

লাসার শাসনকর্তারা মহা রেগেমেগে নিয়ম করলেন, তিব্বতে গেলে সাধু-সন্ন্যাসীদেরো জামিন রেখে যেতে হবে। ওখানে মরগাঁও বলে একটা গ্রাম ছিল, সেখানে ১০ দিন বাস করতে হত। সুখের বিষয়, এ-সমস্ত অসুবিধাও আপনা থেকে দূর হয়ে গেল। মরগাঁওয়ের প্রধান দাদামশায়ের ভক্ত হয়ে পড়ল এবং সব রকম বন্দোবস্ত করে দিল।

হোতি গিরিপথ ১৫০০০ ফুট উঁচু আর বড় দুর্গম। সেই পথে পার হওয়া গেল। ওপারে পেঁছে প্রধান নিজেই জামিন হল। সে এক ব্যাপার। আড়াই সের এক পাথরকে সমান দু-টুকরো করা হল—কি উপায়ে তা জানি না। তারপর টুকরো দুটোকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে শীল মোহর করে লিখে দিতে হল যে এই সাধু ইংরেজের ছদ্মবেশী চর কিম্বা কম্পাস্-ওয়ালা নন্। তিব্বতে গিয়ে ধরা পড়ে যদি প্রমাণ হয় উনি ছদ্ম-বেশী চর, তাহলে কেদার সিং জামিন হয়েছে, অতএব তাকে ঐ আধখানা পাথরের সমান ওজনের সোনা জরিমানা দিতে হবে। এমন কি ওখানকার রাজা ইচ্ছা করলে

boiRboi.net

ওর প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য দাদামশায়ের সে ভয় ছিল না। পাছে চর বলে স্থানীয় লোকরা সন্দেহ করে, সাধুরা তাই জুতো, ছাতা, বা ব্যাগ জাতীয় জিনিস সঙ্গে নিতেন না। দাদামশাই অনেক শারীরিক কষ্ট সয়ে আর মানসিক আনন্দ পেয়ে, কৈলাস, মানস-সরোবর, নানা গুম্ফা, রক্ষিত তিব্বতী হরপে লেখা প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির সংগ্রহ আর বহু পবিত্র জিনিস দেখে নিরাপদে অন্য গিরিপথ দিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর জন্যে কেদার সিংকে কোনো বিপদে পড়তে হয়নি।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে ঐ বিদেশ-বিভূঁইয়ের ভিন্ন ভাষাভাষী গ্রামের লোকরা সঙ্গে করে ফলমূল, দুধ, মাখন, মিষ্টান্ন নিয়ে দলে দলে সাধু দেখতে আসত। তাঁদের শীতের রাত কাটাবার জন্য ছাউনি কিম্বা গোয়ালঘর ছেড়ে দিত। তবু নিশ্চয় শীতে কষ্ট পেতেন, খালি পা, কম্বল ছাড়া গরম কাপড় নেই—কিন্তু সেটুকু তো হবেই।

যৎসামান্য খরচে, স্বেন হেদিনের যাত্রার প্রস্তুতিতে যত সময় লাগত তার সিকির সিকির চেয়েও কম সময়ের মধ্যে তোড়জোড় করে, লাঠি কমণ্ডলু কাঠের বাটি আর দুজন সঙ্গী সম্বল নিয়ে, দাদামশাই মানস-সরোবর আর কৈলাস পাহাড় দেখে এসেছিলেন, আজ থেকে আশী বছর আগে।

ওষুধ

বছর চল্লিশেক আগে আমার একবার চিংড়িমাছের কাটলেট খেয়ে বেজায় পেটের অসুখ করেছিল। প্রায় নাড়ি ছেড়ে যাবার জোগাড়, চোখে অন্ধকার দেখছি। এমন সময় আমার বড় ভাসুর বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, আমাকে এক ডোজ কি যেন ওষুধ খাইয়ে, হাসি-হাসি মুখ করে, আমার খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসে রইলেন। ব্যস্, ঐ এক ডোজেই আমি একেবারে ভালো হয়ে গেলাম। তখন দু-দিন জল-পথ্য, তৃতীয় দিনে পোরে ভাতের ব্যবস্থা দিয়ে, দাদামণি বিদায় নিলেন।

অমনি তাঁর বোনেরা আমাকে ঘিরে বসলেন। পটোদিদি—পটোদিদির কথা তো আগেও বলেছি—বললেন, 'কি ওষুধ দিল, তোকে বলেনি নিশ্চয়? তোকে ভালো

মানুষ পেয়ে ভারি চালাকি করে গেল দেখছি! আমরা বাপু প্রতাপ মজুমদারের মেয়ে, আমাদের সঙ্গে বুজরুগি চলবে না—'

এই অবধি শুনে আমি বললাম, 'না, না, পটোদিদি, ওষুধের নাম বলে গেছেন।' বললাম-ও ওষুধের নামটা, এখন ভুলে গেছি। নাম শুনে দুই বোন গালে হাত দিয়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'দেখলে কান্ড! বোকা পেয়ে কেমন চাল দিল! আমরা থাকলে কক্ষনো তোকে ও ওষুধ গিলতে দিতাম না। নেহাৎ ভগবান তোকে বাঁচিয়েছেন!'

পটোদিদি বললেন, 'স্পষ্টই বুঝতে পারছি ওটা একেবারে ভুল ওষুধ। সাধারণ নক্স ভমিকা থাট্টি দিলেই কাজ হত!' আমি বললাম, 'কি মুশ্‌কিল! ওঁর দেওয়া এক ডোজেই আমি একেবারে সেরে গেছি, তবে আবার ভুল ওষুধ কিসের?'

খুনুদিদি কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'যদি প্রেতপুজো করে তোর অসুখ সারত, তাহলে কি বলতিস্ প্রেতপুজোই ঠিক ওষুধ? অবিশ্যি পটোদিদি যাই বলুক, নক্স ভমিকাও ঠিক ওষুধ নয়। এ তো পরিষ্কার পাল্‌সেটিলার ব্যাপার!'

পটোদিদি চটে গেলেন, 'তোর স্বামী বাঘ শিকার করে, তুই আবার এ-সবের কি জানিস্?'

খুনুদিদি বললেন, 'তা তো বটেই! বাবা বলতেন আমি জাত চিকিৎসক। রুগীর বুকে কান দিয়ে আমি তার শরীরের নাড়ি-নক্ষত্র বুঝতে পারি। স্টেথোস্কোপের সাহায্য লাগে না। সে যাই হোক, গুরুতর কিছু পাকিয়ে উঠবার আগেই ওঁদের ভাই এসে বললেন, 'রুগীর ঘরে এত হট্টগোল ভালো নয়। তা ছাড়া এ দিকের ঘরে গরম কফি তৈরি হচ্ছে।' বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উঠে গেলেন।

আমার নিজের ভালোমানুষ ননদটির জ্যাঠতুতো দিদিদের মতো নিজের ওপর অতখানি আস্থা না থাকলেও, তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে অব্যর্থ বীরেশ্বরের মাদুলী পেয়েছিলেন। ঐ মাদুলীর জোরে তিনি যে কত বন্ধ্যা মেয়ের দুঃখ ঘুচিয়েছিলেন তার ঠিক নেই।

একবার আমার স্বামীর এক রুগী এসে ধরে পড়লেন, 'বৌমার ছেলেপুলে হয়নি বলে বড় দুঃখ। এত টাকা-কড়ি কে ভোগ করবে? ডাক্তার-কবরেজ করেও কিছু হল না, এখন দৈব-যোগ ছাড়া গতি নেই দেখছি।' কথাচ্ছলে আমার স্বামী তাঁর দিদির বীরেশ্বরের মাদুলীর কথা বললেন।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরঝি বৌমাকে দিলেন সেই মাদুলী। মাদুলীর মধ্যে কি পুরে দিলেন সেটা বলতে গুরুদেবের বারণ ছিল। তবে নিয়মগুলো শিখিয়ে দিতে হল। মাদুলী বৌমার মাথার চুলে বাঁধা থাকবে। শনি মঙ্গলবার শুধু ফল দুধ মিষ্টি খেয়ে থাকতে হবে। মুরগিটুরগি কোনো দিনই চলবে না। ব্যস্! আর কিছু নয়। বছর না ঘুরতে বৌমার দুঃখ দূর হবে। শ্বশুর-শাশুড়ি কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় নিলেন।

তাঁরা চলে গেলেন, দেখি ঠাকুরঝির মুখ গম্ভীর। কি ব্যাপার? না, ওঁদের একটা

boiRboi.net

কথা বলা হয়নি। ওঁরা হয়তো ছেলে চান। কিন্তু আজ পর্যন্ত যাকেই ঠাকুরঝি মাদুলী দিয়েছেন, তারি মেয়ে হয়েছে। তা-ও একটা মেয়ে নয়, পর পর গোটা তিন চার!

আমি বললাম, 'তাতে কি হয়েছে? আজকাল তো মেয়েরাও সম্পত্তি পায়।'

শেষ অবধি কি হয়েছিল বলতে পারছি না। আমরা মোটে চারটি মেয়ের হিসাব রেখেছিলাম। ওঁরা কিন্তু খুব খুসি।

১৯৩১ সালে শান্তিনিকেতনে কারো ছোটখাটো অসুখ করলে, রবীন্দ্রনাথ বেজায় খুসি হতেন। তাঁকে ডাকার জন্য অপেক্ষা করতেন না। অমনি বায়োকেমিস্ট্রির বাক্সটি নিয়ে, তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। দস্তুর মতো বই পড়ে, লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ দিতেন। তারপর রোজ গিয়ে রুগীর অবস্থা দেখে আসতেন। দু-চার দিনেই সে সেরে উঠত।

মনের পেছনে এই সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে, আমিও কিছু দিন বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে রুগীর চিকিৎসা করেছিলাম। ব্যাপার হল যে আমার বড় ভাসুর একটা চটি হোমিওপ্যাথির বই আর একটা মস্ত কাঠের বাক্সের গোলগোল খোপে চল্লিশটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি ভরে আমাকে দিলেন।

দাদামণি বলেছিলেন, বাড়িতে কারো ছোট-খাটো অসুখ-বিসুখ হলেই ডাক্তার না ডেকে, বইটি পড়ে, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ওষুধ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

boiRboi.net

হোমিওপ্যাথিক ওষুধে বিষ থাকে না, সে রকম বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই।

তাই দিতে আরম্ভ করে দিলাম, ছেলেমেয়ের, কিম্বা বাড়ির কাজের লোকদের অসুখবিসুখ হলে। সব্বাই সেরে যেত। চাকর-মহলে ক্রমে আমার বেজায় পসার জমল। বাড়ির চাকরদের থেকে আরম্ভ করে ধোপা, ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি, শিল-কুটানো-ওয়ালা, পিওন, ফ্ল্যাট্‌বাড়ির দারোয়ান, জমাদার, অন্য ভাড়াটেদের যাবতীয় পরিচারকদের মধ্যে আমি ফলাও করে চিকিৎসা করতে লাগলাম। বিশ্বাস করুন সব্বাই সেরে যেত। যেহেতু আমার স্বামী সমস্ত ব্যাপারটাকে কুনজরে দেখতেন, তাই অধিকাংশই সম্পন্ন হত তিনি যখন নিজের কাজে ব্যস্ত।

যে কোনো সকালে পেছনের কাঠের সিঁড়ি থেকে পেয়ালা হাতে, মগ্ হাতে, লাইন শুরু হত। এমনি ভাবে দরাজ হাতে ওষুধ বিতরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হল যে এক দিন আমার মামুলী ওষুধ সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু রুগীরা নাছোড়বান্দা। তখন নিরুপায় হয়ে কাছাকাছি নামওয়ালা ওষুধ দিতে লাগলাম। এবং সমান ফল পেতে লাগলাম।

বৈজ্ঞানিকরা যা খুসি বলতে পারেন, কিন্তু অন্য ওষুধ দিলেও কাজ দিত। হতে পারে আমার রুগীরা আমাকে গুরুমার মতো ভক্তি করত বলে। বাড়ির লোকে এই অস্বাভাবিক সাফল্যে উদ্বেগ প্রকাশ করলে বলতাম, 'সেরে যখন যাচ্ছে তখন ভুল ওষুধ বলছ কি করে? ওদের সব সর্দি কাশি জ্বর পেটব্যথা দূর হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি খারাপ হচ্ছে?' দেখতে দেখতে ওষুধের বাক্স চাঁচাপোঁছা!

সুখের বিষয়, এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ গরম হয়ে উঠল, আমরাও সে-বছরের মতো পাট গুটিয়ে দারজিলিং গেলাম। শীতের আগে ফিরে বোমা-বিস্ফোরণের মধ্যে পড়লাম। অসুখ-বিসুখের সময় কারো রইল না। পরে ওষুধের বাক্সটাকে অনেক খুঁজেছিলাম, কিন্তু পাইনি।

boiRboi.net

স্বামীরা

স্বামীদের কথা বলতে হলে আমার শ্রদ্ধাভাজন মাস্টারমশাই জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েই শুরু করি। অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। ইংরিজি কাব্যসাহিত্য যাকে বলে তাঁর নখাগ্রে থাকত। কিন্তু আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন অতটা টের পাইনি। আমার বয়স হয়তো সাত কি আট। গরমের ছুটিতে ওঁরা পাহাড়ে এলেন। আমাদের পাশের বাড়ির ও-পাশের বাড়িতে উঠলেন।

দুপুরে মাস্টারমশাই বোধ হয় পড়াশুনো করতেন। ওঁর স্ত্রী সেই সময়ে আমার মা-র সঙ্গে গল্প করতে আসতেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একদিন তিনি মা-কে বলছিলেন, "আমার স্বামীকে লোকে ভারি ভালোমানুষ বলে, কিন্তু ওঁর সঙ্গে ঘর করা যে কি কঠিন ব্যাপার তা জানলে কেউ বলত না। এই ধরুন ভাই, পাহাড়ে আসবার আগে বাক্স গুছোচ্ছি তা উনি এসে বললেন, 'তোমাদের জিনিসপত্র তোমাদের যেমন খুশি গুছোতে পার, কিন্তু আমার বাক্সে আমার সব জিনিসপত্র যেন একেবারে ওপরে থাকে।' আমি বললাম, 'বেশি দরকারি জিনিস তো আমি সর্বদা ওপরেই রাখি। যাতে বাক্স খুললেই পাও।'

তাতে বললেন, 'দরকারির আবার কম বেশি কি? না, না, আমার সমস্ত জিনিস ওপরে রেখো, যাতে বাক্সের ডালা খুললেই সব একসঙ্গে দেখতে পাই।' শুনেছেন কখনো এমন কথা?"

মা তো অবাক!

আমার মা একাধারে শান্তিপ্রিয় আর বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে কক্ষনো নিজের মতটা পেশ করতেন না। আমাদের বাড়িতে বাবা যখন যা বলতেন তাই হত। মায়ের যে অন্য রকম মত হতে পারে এ-কথা আমাদের স্বপ্নেও কখনো মনে হয়নি। একবার মনে আছে শিবপুরে আমার মাসির বাড়ির ওপর তলায় স্যার কে জি গুপ্তর এক ছেলে থাকতেন। তাঁর মেম-স্ত্রী আর মেয়েরা গল্প করতে নিচে আসত।

সুগৃহিণী বলে মেমের ভারি সুনাম ছিল। ওঁদের বাড়ি থেকে কখনো টুঁ শব্দটি শোনা যেত না। সব মেশিনের মতো চলত। আমার মাসিতে মেসোতে খুব মতভেদ তর্কাতর্কি হত।

একদিন মেম মাসিকে বললেন, 'দেখুন, সুখে সংসার করতে হলে, কখনো তর্কাতর্কি করবেন না।' মাসি আকাশ থেকে পড়লেন, 'বলেন কি! তর্ক না করলে চলে কখনো? সংসার সম্বন্ধে পুরুষদের কোনো ধারণা আছে? যত সব উদ্ভট মতামত! সবাই তো আপনার কর্তার মতো নয়।'

BanglaBook.org

মেম হাসলেন, 'সব পুরুষমানুষই এক রকম। কিচ্ছু জানে না, খালি ঝুড়িঝুড়ি মতামত। তা আমি কখনো তর্ক করি না। উনি যা বলেন শুনে যাই। তারপর কাজের বেলা, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামতো করি। উনি কিচ্ছু টের-ও পান না। পুরুষমানুষ সাধে বলে!'

তর্কের কথাই যখন উঠল, আমার স্বামীও কিছু কম যান না। আরে তর্ক করবি তো আমাদের মতো সোজাসুজি নিজের মতটা প্রকাশ করে যা বলবার বল্! তা নয়। একরাশি তথ্য, প্রমাণ, পরিসংখ্যান, শতকরা হেনাতেনা, অমুক রিপোর্টে বেরিয়েছে বলে এমনি বিতিকিচ্ছির কান্ড করবেন যে তর্ক করবার সব সুখ চলে যাবে!

শুধু তাই নয়। ধরুন আমি কোথাও যাবার, কিম্বা কিছু করবার প্রস্তাব দিলাম, অমনি উনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন, আমার প্রস্তাবে কোথায় খুঁৎ আছে তা দেখিয়ে দিতে। আবার কখনো আমি কিছু বললাম তো চুপ করে শুনে গেলেন। যে-কোনো শ্রোতার মনে হতে পারে আগের প্রস্তাবে ওঁর আপত্তি এবং পরেরটাতে সমর্থন আছে। আসলে ঠিক তার উল্টো।

আগেরটা করবার ইচ্ছে আছে, তবে খানিকটা রদ-বদল করে নিজের পছন্দসই করবার পর। পরেরটা উনি কোনো মতেই করবেন না, এমন কি তাই নিয়ে বৃথা নিশ্বাস খরচ পর্যন্ত করবেন না।

স্বামীদের বিষয়ে বাস্তবিক একটা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া লেখা যায়। কি যে ওঁদের পছন্দ আর কি যে নয়, তাই বোঝা দায়। সুন্দরের কথাই ধরি। আমরা যাদের সুন্দরী বলি, তাদের দেখে নাক সেঁটকাবেন। অথচ ওঁদের বন্ধুবান্ধবদের হতকুচ্ছিৎ ন্যাকা বৌদের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

গিয়ে হয়তো দেখা যাবে রোগা, হট্‌কা, উটকপালী, এ কান থেকে ও-কান হাঁ— যাক গে বলে লাভ নেই!

এর ওপর আরো আছে, অন্যদের বাড়ির রান্না আর সেখানকার গিন্নিদের ঘর-কন্নার প্রশংসা কোন স্বামী না করেন? বাড়িতে যা দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়, অন্যদের বাড়িতে ঠিক তাই দেখে ভালো লাগে! এর ওপর কোনো কথা হয়!

ইয়োরোপে ভ্রমণ করে এসে আমার নতুন দিদি একটা মজার গল্প বলেছিলেন। একটা বিখ্যাত পাহাড়ে শহর। ছোট্ট শহর। সেখানকার এক বিখ্যাত হোটেল। ভারি রোমাঞ্চময় ব্যাপার; চারদিকে চোখ-ভোলানো বরফের পাহাড়; অনেক নিচে নীল হ্রদ; চাঁদের আলোয় একটা লোক গীটার বাজাচ্ছে।

শাদা পোষাক পরা বেজায় মোটা হোটেলওয়ালা নতুনদিদিদের সঙ্গে এসে ভাব করল। বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের বেজায় রোমাঞ্চময় দেশ। আমার গালে এই যে কাটার দাগ দেখছেন, এর পেছনেও একটা প্রেমের ইতিহাস আছে। একটা লোকের সঙ্গে

BanglaBook.org

ডুয়েল্ লড়ার চিহ্ন এটা। বলা বাহুল্য ছয় মাস হাসপাতালে কাটিয়ে, সে ব্যাটা বিদেশে পালিয়েছে। শুনেছি কালকুতা বলে একটা জায়গায় তার মস্ত ব্যবসা আছে।

আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমি সেই অতুলনীয়াকে বিয়ে করে, পরম সুখে হোটেল চালাচ্ছি।'

গল্প শুনে উৎসাহিত হয়ে, নতুনদিদি বললেন, 'এই বিদেশিনী কি তাকে একবার দেখতে পাব না? দেশে ফিরে গল্প করব।'

আহ্লাদে গলে গিয়ে হোটেলওয়ালা বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঐ তো বড় ট্রে নিয়ে সে এদিকেই আসছে।'

নতুনদিদি ফিরে দেখলেন যত না লম্বা তার চেয়ে চওড়া, মাথায় কয়েক গাছা চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, জুতোর বোতামের মতো পিটপিটে চোখ, ঢিব্‌লি নাক, হাঁড়ি মুখ।

boiRboi.net

অবাক হয়ে হোটেলওয়ালার দিকে তাকাতেই, সে বলল, 'আশ্চর্য হলেন নাকি? আহা! ওর রান্না তো এখনো খাননি! ওর জন্য একবার কেন, আমি একশোবার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নামতে রাজি আছি!'

বুঝুন একবার স্বামীদের কি পছন্দ!

কলকাতার রাস্তায়

কলকাতার রাস্তায় কেন ভিড় জমে তা বুঝে ওঠা দায়। একদিন সিনেমার তিনটের শো ভাঙলে পর আমার ভাই আমি বাইরে এসে দেখি বেজায় ভিড়। সঙ্গে তার বন্ধু মিহির। মিহিরের গাড়ির খোঁজে দুজনে ভিড় ঠেলে এগুচ্ছে, এমন সময় পেছনে সোরগোল ধর—ধর—ধর—পালাল—পালাল! সঙ্গে সঙ্গে পর পর দশ বারোটা লোক প্রায় ওদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে দৌড়—দৌড়!

কে যে চোর আর কে যে তাকে ধরছে কিছুই মালুম দিল না। কি ব্যাপার? কার জানি গলা থেকে সত্যিকার সোনার বিছে হার ছিনতাই করে, চোর পালিয়েছে! যে গিন্নির হার গেছে, তিনি ডুকরে কেঁদে আকাশ ফাটাচ্ছেন!

সবাই তাঁকে বকছে, 'আজকালকার দিনে কেউ সত্যি সোনার হার গলায় দিয়ে বেরোয়? নকল সোনা তো অবিকল এক রকম দেখতে। বরং ঢের ভালো, আরো ঝক্‌মকে!' গিন্নি কেঁদে বলছেন, 'এ-ও তো অবিকল নকল সোনার মতো দেখতে! তেমনি ঝক্‌মকে, তেমনি ভালো!'

একজন রোগা ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'মেয়েদের কাণ্ড তো, বুঝুন ব্যাপার!'

এদিকে এই সব ব্যাপার দেখে হাসতে হাসতে আমি আর মিহির তাদের গাড়ির কাছে এসে পড়েছি। ততক্ষণে চোর এবং তার অনুসরণকারীরা হয়তো পৌনে এক কিলোমিটার এগিয়ে গেছে। গাড়ির দরজা খুলে আমি ভেতরে পা দিতে যাবো, এমনি সময় সেই রোগা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললেন, 'মাপ করবেন! একটা বড় ভুল হয়ে গেছে।'

এই বলে আমির কোটের পকেটে হাত সেঁদিয়ে লম্বা এক ছড়া সোনার বিছে হার টেনে বের করে নিয়ে, স্যাঁ—ৎ করে নিমেষের মধ্যে সেই পাতলা-হয়ে-আসা ভিড়ের মধ্যেই বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

boiRboi.net

আমি আর মিহির এমনি হতভম্ব হয়ে গেল যে তার পরেই যখন পেছন থেকে রব উঠল, 'কাঁমড়াঁবে'! কাঁমড়াঁবে'!' এবং তার পরেই, 'কাঁমড়ে'ছে'! কাঁমড়ে'ছে'!' ওরা ফিরেও তাকাল না।

আরেকবার ঐ মিহিরের গাড়ি করেই দুজনে রাসবিহারী এভেনিউ দিয়ে গড়িয়া-হাটের দিকে এগোচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় ঐ পথে এমনি ভিড় যে, কি গাড়ি, কি মানুষ, এগোয় কার সাধ্যি! মিহিরের গাড়ির ঠিক সামনেই এক বুড়ি আবার ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটা ধরল।

মিহির যতই হর্ণ বাজায়, যতই চ্যাঁচায়, 'ও বুড়ি মা, ও বুড়ি মা, ফুটপাথে উঠুন!' তা কে কার কথা শোনে! এদিকে পেছনের গাড়ির চালকরা বুড়িকে দেখতে পাচ্ছে না, তারা মহা রেগে হর্ণ দিচ্ছে, চ্যাঁচাচ্ছে, যাচ্ছেতাই করে গাল দিচ্ছে!

অগত্যা নাচার হয়ে মিহির গাড়িটাকে বুড়ির ছয় ইঞ্চির মধ্যে এনে খুব জোরে হর্ণ দিল। আর যায় কোথায়! বুড়ি শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ে, 'ওরে বাবারে! গেলাম রে! মেরে ফেললে রে!' বলে এমনি চেল্লাতে লাগল যে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে যাকে

বলে ট্র্যাফিক্ জ্যামের অতিবৃদ্ধ ঠাকুরদাদা!

শুধু তাই নয়। কোত্থেকে দলে দলে মাস্তানরা বেরিয়ে এসে, 'কি পেয়েছেন, মশাই! গাড়ি হাঁকাচ্ছেন বলে অকাতরে মানুষ মেরে চলে যাবেন! এ কি মগের মুল্লুক!' ইত্যাদি বলতে বলতে গাড়িটাকে ঘেরাও করে ফেলে, নেচে কুঁদে একাকার কাণ্ড বাধিয়ে দিল।

ওরা যতই বলে, 'চেয়ে দেখ, বুড়িকে আমরা ছুঁইনি! ওর কিচ্ছু হয়নি!' তা কে শোনে!

শোনা দূরে থাকুক, একজন পাণ্ডা গোছের মাস্তান একটা লোহার ডাণ্ডা ঘোরাতে ঘোরাতে, টপ্ করে গাড়ির বনেটের ওপর চড়ে শাসাতে লাগল, 'চালাকি চলবে না, মশাই! বেরিয়ে আসুন! আজ আপনাদের দেখে নেব!' সঙ্গে সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও 'দেখে নেব! দেখে নেব!' বলে নাচতে লাগল। বুড়ি কিন্তু ততক্ষণে সট্কান দিয়েছে!

এতক্ষণ উভয় পক্ষের কেউ কারো মুখ দেখেনি। হঠাৎ পাণ্ডার কি খেয়াল হল, মাথা নিচু করে, সামনের কাচের ভেতর দিয়ে গাড়ির আরোহীদের মুখের দিকে তাকাল।

তাকিয়েই যেন ভূত দেখেছে, এমন করে আঁৎকে উঠে, ডাণ্ডা ফেলে, বনেট থেকে নেমে পড়ে, হাত জোড় করে অমিকে বলতে লাগল, 'স্যার! আপনি, স্যার! দেখতে পাইনি! আপনার পায়ে পড়ি স্যার, অপরাধ নেবেন না!'

এই বলেই স্যাঙাৎ-শাকরেদদের প্রচণ্ড ধমক, 'কাকে কি করিস্ তোরা, একটা আক্কেল নেই!! দেখছিস্ না, গাড়িতে স্যার নিজে রয়েছেন!' মুহূর্তের মধ্যে কোথায় কে! চারদিক ভোঁ—ভোঁ! যেখান থেকে এসেছিল, মাস্তানসুদ্ধ সব্বাই সেখানে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ভাবিত মুখে গড়িয়াহাটে ঢুকে, নিরিবিলি জায়গা দেখে গাড়ি থামিয়ে, মিহির বলল, 'এবার রহস্য খুলে বল্। সেই যে কিছুদিন মাস্টারি করেছিলি, তখনকার ছাত্র নাকি? এত ভক্তি! কি আশ্চর্য!'

অমি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'আরে ধ্যুৎ! আমি রেস্ খেলার মাঠে গেলেই ওরা আমার পিছু নেয়। 'বলে দিন স্যার, কোন ঘোড়া জিতবে!' আমি যে আন্দাজে যে ঘোড়ার নাম বলি, সে-ই নাকি সর্বদা জেতে!'

boiRboi.net

বাঘের গল্প

বলেছি তো চার রকম গল্প খুব উত্‌রোয়, বাঘের প্রেমের চোরের আর ভূতের। তার মধ্যে বাঘের কথাই ধরা যাক। ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে অজস্র বাঘের গল্প শুনে এসেছি। আমাদের দেশের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিশনের মসুয়া গ্রামে।

চারদিকের জল-জংলায় বড় বড় ডোরাকাটা বাঘ কিলবিল করত। তারা দিনের বেলাও গ্রামে এসে দাপিয়ে বেড়াতে পেছপাও হত না! বেঘো কাশি শোনামাত্র চারদিকে, 'বাঘ আইসে! বাঘ আইসে!' রব উঠত। যে যেখানে ছিল দুমদাম দরজা-জানলা বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকত। যতক্ষণ না গাঙ পার হয়ে বাঘের বনে ফেরার খবর পাওয়া যেত, ততক্ষণ কেউ বেরোত না। শুনেছি বাবার ঠাকুমার সময়ও এইরকম অবস্থা ছিল।

বাবার ছোটবেলাটা দেশে কেটেছিল, তবে ততদিনে বাঘের উপদ্রব অনেক কমে গেছিল। কমেছিল, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়নি। আমার বড় জ্যাঠা, মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে শরীর মজবুত করাতে বিশ্বাস করতেন। ছুটিছাটাতে দেশে গিয়ে গাঁসুদ্ধ ছেলেদের নিয়ে খেলাধুলো, মাছ-ধরা, সাঁতার কাটা, শিকার করায় মেতে যেতেন।

কি শিকার? না বুনো শুওর আর শেয়াল। এরা গৃহস্থদের তরমুজ ক্ষেতের বড়ই ক্ষতি করত। ঠিক হল ফাঁদ তৈরি করে, শেয়াল ধরা হবে। মহা উৎসাহে জাল দিয়ে কাঠ দিয়ে ফাঁদ তৈরি হল। তারপর প্রায় রোজই ফাঁদে শেয়াল পড়তে লাগল। সকলের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল।

একদিন ছে ট জ্যাঠা আর বাবা, দুজনে সবার আগে উঠে, বড়দের কাউকে কিছু না বলেই ফাঁদ দেখতে ছুটলেন। কেউ কোথাও নেই, চারদিক থমথম করছে, পাখিটাখিও ডাকছে না। আর ফাঁদের মধ্যে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে, গোঁপ ফুলিয়ে একটা হলদে-কালো ডোরাকাটা বাঘ বসে রাগে ফোঁসফোঁস করছে! শুনেছি ঠাকুমার বকাবকির ফলে ফাঁদ ভেঙে ফেলা হল।

বাঘের সঙ্গে বাবার মোকাবিলা হয় এর অনেক পরে, যখন ভারতীয় জরীপ-বিভাগের কাজে উত্তর-পূর্ব ভারতে, শ্যামদেশ, বর্মায় বনে জঙ্গলে তাঁকে দলবল নিয়ে যেতে হত। যত না চোখে দেখতেন, তার চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্য সব গল্প শুনতেন।

একবার বর্মার বেঘো জঙ্গলে মাপ-জোকের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ আর জবরদস্ত

boiRboi.net

লোক নেওয়া হচ্ছিল। একজন লম্বা চওড়া আধা-বয়সী পূর্ববঙ্গের লোক এসে দরখাস্ত দিল। এই ধরনের লোকই দরকার ছিল, শক্ত পোক্ত শরীর, মনে হল কষ্ট সইতে পারবে আর সাহস আছে। লোকটাকে বাবার পছন্দ হল।

দোষের মধ্যে বাঁ হাতটা কাঁধ থেকে কাটা, অথচ বর্মার দুর্গম সব জায়গায় অনেক দিন কাটিয়ে এসেছে, ওদিককার ভাষাও কিছু কিছু জানে। একটা ভাষা তো আর নয় ; জায়গায় জায়গায় স্থানীয় ভাষা। জরীপের কাজও খানিকটা রপ্ত ছিল ; একটা হাত কুড়িটা হাতের মত দক্ষ। শেষ পর্যন্ত তাকেই নেওয়া হয়েছিল এবং অনেক বছর সে ওস্তাদের মতো জরীপের কাজ করেছিল। নাম তার রাঘব।

সেই লোকটার মুখে বাবা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনেছিলেন। সেকালে অনেক সাহসী বাঙালী ব্যবসাদার কাঠ কাটার জন্য বর্মার বনের অনেকখানি করে জায়গা ইজারা নিত। ভারতে বর্মায় সব জায়গায় ব্রিটিশ রাজত্ব, তাই এতে কোনো অসুবিধা ছিল না।

বর্মার বন নানারকম দামী গাছে ভরতি ছিল, শাল, সেগুন, মেহগিনি। আসবাব তৈরি করার জন্য সুদূর বিদেশেও তার চাহিদা ছিল। ভালো টাকা পাওয়া যেত বলে রাঘব আর তার ছোট ভাই জানকী নাম লিখিয়ে বর্মা গেল। বয়স তাদের কুড়ি-একুশ, বিয়ে-থা করেনি, ভারি বে-পরোয়া।

বনের মাঝখানে কাঠগুদামের ক্যাম্প। ও জায়গায় মানুষখেকো বাঘের বেজায় উপদ্রব। কাছেই সালওয়েন নদী বয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পের চার দিক ঘিরে ২৫ ফুট গাছের গুঁড়ির দেয়াল। সেই দেয়ালে যাওয়া আসার দরজা বসানো। বাঘ নাকি ২২ ফুটের বেশি লাফায় না। অন্ততঃ ইজারাদার তাই বুঝিয়েছিল।

সারাদিন বাঘরা ঝোপেঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত, সন্ধ্যে হলে বেরোত। খালাসীরাও সারা দিন দা টাঙি কুড়ুল বন্দুক নিয়ে হৈ-হল্লা করে গাছ খুঁজত, পরখ করত, মাপত, দাগা দিত, পরে কাটত-ও। কিন্তু সূর্য ডোবার আগেই রোজ ডেরায় ফিরে আসত।

ডেরা মানে ঐ ২৫ ফুট দেয়াল ঘেরা, লম্বা একটা কাঠের বাড়ি। তাতে দুটি মস্ত ঘর। একটাতে ২৬টা সরু তক্তাপোষ। প্রত্যেকটার তলায় মালিকের ছোট টিনের তোরঙ্গ। অন্যটাতে উনুন আর রান্নার সরঞ্জাম, ২৬টা পিঁড়ি, তাকের ওপর ২৬টা পেতলের থালা, বাটি, গেলাস। তখনো ওসব জায়গায় এলুমিনিয়ামের চল হয়নি।

ঘোর জঙ্গলে চোরের উপদ্রব ছিল না। তাছাড়া ২৬ ফুট দেয়াল ঘেরা ক্যাম্প। বেরোবার ফটকে তালা দেওয়া থাকত। এমনি স্বাস্থ্যকর হলেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। জানকী দু-জন লোক সঙ্গে নিয়ে, কাছের গঞ্জ থেকে মাসকাবারের সওদা করতে গিয়ে, জ্বর গায়ে ফিরল।

জানকী তো শয্যা নিল। ম্যালেরিয়ার বাড়িও খেল। এদিকে বর্ষা নামার আগে গাছ-কাটার কাজ শেষ করে ফেলতে না পারলে, বড় ক্ষতি হবে। সকলেই মহা ব্যস্ত,

BanglaBook.org

রুগী দেখে কে? শেষপর্যন্ত তাকে ওষুধপত্র দিয়ে, মাথার কাছে খাবার জল রেখে, সবাই কাজে বেরোল। খেয়েদেয়ে বেরোত, আবার ফিরে এসে পালা করে রান্না চাপাত।

তা ফিরবে তো সেই সন্ধ্যার আগে। জেব্বারো ভাইকে একা ফেলে রেখে যেতে রাঘবের মন খুঁতখুঁত করলেও, উপায় ছিল না। বাতাস চলাচলের জন্য বাড়ির দরজা খোলা রইল। বাইরের ফটকে তালা দেওয়া হল।

বিকেলে ফিরে এসে জানকীর কাছে যেতেই, সে বলল, 'দাদা, এই বড় বাঘ এসে তক্কাপোষ আর পিঁড়ি গুণে গেছে। রাতে এসে নিশ্চয় মানুষ নিয়ে যাবে। চল, আমরা সকলে নৌকো করে গঞ্জে পালাই।'

এ-কথা শুনে ক্যাম্পের লোকদের কি হাসি! 'ব্যাটা প্রলাপ বকছে। বাঘ কি ২৫ ফুট লাফাতে পারে, না কি পিঁড়ি গুণতে পারে! আমরা এই ক্লান্ত শরীরে দাঁড় বেয়ে গঞ্জে যাই আর কি!'

কিন্তু জানকী ওদের কথা মানল না। তখন তার জ্বর নেই, মাথা ঠাণ্ডা। সে বলল, 'আমি তো জানি কি দেখেছি। দাদা, ওরা যখন যাবেই না। চল আমরা যাই। বিধবা মায়ের ছেলে আমরা।'

ওর পেড়াপিড়িতে শেষপর্যন্ত দুই ভাই দুটি কাটারি হাতে বেরিয়ে পড়ল। ক্যাম্পের সকলে হতভম্ব। নদীর ঘাটে পৌঁছে জানকী বলল, 'আগে ওদের নেবে। তারপর বাঘরা আমাদের খুঁজতে আসবে। ওরা সাঁতার জানে। এসো খান ২০-২৫ বল্লম বানাই।'

বল্লম বানাতেই রাত হয়ে গেল। তারি মধ্যে জানকী হঠাৎ বলল, 'ঐ দেখ!' রাঘবের মনে হল কি একটা বড় জিনিস নিয়ে একটা বাঘ বনে ঢুকে পড়ল! রাঘবের মুখে আর কথা নেই!

boiRboi.net

আরো ৮-১০টা বল্লম আর মশাল তৈরি করতে আরো ৫-৭ বার ঐ রকম মনে হল। তারপর ভীষণ গর্জন শোনা যেতে লাগল। জানকী বলল, 'আর দেরি নয়। ওরা বুঝেছে দুটো লোক কম! শীগগির মশাল বল্লম নিয়ে নৌকোয় ওঠা যাক।'

মনে মনে রাঘব ভাবছিল, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! কিন্তু মাঝ নদীতে পেঁছবার আগেই কয়েকটা বাঘ জলে নেমে ওদের পিছু নিল। তখন মশাল জেবলে বল্লম নিয়ে একজন তাদের ঠেকায়, আর একজন প্রাণপণে দাঁড় টানে! এইভাবে অনেক কষ্টে প্রাণ হাতে নিয়ে এক সময় তারা বনের এলাকা ছাড়িয়ে এল। বাঘরা পেছিয়ে পড়ল। এর মধ্যে একটা বাঘ নৌকোর কাঁদার কাছে এসে থাবা মেরে রাঘবের হাতের অনেকটা মাংস তুলে নিয়েছিল। গঞ্জে পেঁছে ওষুধপত্র করলেও, হাতটা বিষিয়ে গেল। হাত কেটে ফেলতে হল।

ইজারাদার ওদের কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বন্দুক-টন্দুক নিয়ে যারা দেখতে গেছিল, তারা ফিরে এসে বলল, 'কেউ নেই। খালি থাবার দাগ।'

ইন্দ্রজাল

আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে অদ্ভুত সব গল্প শুনিয়ে যান। বলেন তো সবই সত্যি, তবে সে বিষয়ে আমি হলফ করে কিছু বলতে পারব না। কিন্তু আমার নিজের সেই সুরুলের সার্কাসওয়ালার রুমালের পুতুল-নাচের কথাটা এক বর্ণ বাড়িয়ে বলিনি।

কিন্তু ও-গল্প শুনে আমাদের প্রিয় বন্ধু ডঃ সেনগুপ্ত বললেন, 'তা কি করে সম্ভব হতে পারে, আপনিই বলুন।' আমি একটু গরম হলাম, 'তাই যদি বলতে পারতাম তাহলে আর আশ্চর্যের কি বাকি থাকত? যেমন দেখেছিলাম, তেমন বলেছিলাম। আমার সঙ্গে পূর্ণিমা ঠাকুর ছিলেন। তিনিও দেখেছিলেন।'

তখন আস্কারা পেয়ে আমাদের প্রিয় বন্ধুটি এক আশ্চর্য গল্প বললেন। সে-ও নাকি সত্যি। তিনি নিজে না দেখলেও, যে-সব প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে ব্যাপারটা বলেছিলেন, তাঁদের অবিশ্বাস করা যায় না।

একজন সত্যিকার সাধুর গল্প। লোকে বলত তাঁর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু খ্যাতি পাবার জন্য তিনি এতটুকু লালায়িত ছিলেন না আর ক্ষমতার

boiRboi.net

প্রমাণ দেবার-ও কোনো আগ্রহ-ই ছিল না। তবু লোকে ছাড়ত না। একবার সন্ধ্যা-বেলায় এলাহাবাদের কাছে কোনো বাগানে, অনেকে মিলে তাঁকে কোণঠাসা করে-ছিলেন। কিছু না দেখে তাঁরা নড়বেন না।

শেষটা মরীয়া হয়ে তিনি বললেন, 'বেশ, নেহাৎ যখন ছাড়বেনই না, একটা ছোট জিনিস দেখাচ্ছি। আপনারা কি খেতে চান?'

এমন কথা শুনে তাঁরা হকচকিয়ে গেলেন। খেতে কে না ভালোবাসে, কিন্তু সবাই মিলে হঠাৎ একটা নাম করা মুশকিল। সাধু বললেন 'আচ্ছা, দই-বড়া খাবেন?' শুনে সবাই মহা খুশি। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই খাব। দই-বড়া তো ভালো জিনিস।'

সাধু তখন একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সাজ-সরঞ্জাম, পুঁথি-মাদুলী, কিচ্ছু ছিল না। একেবারে খালি হাত। তারপর একটু ইতস্ততঃ ভাবে চার-দিকে তাকাচ্ছেন দেখে দর্শকদের ধৈর্য থাকে না, 'কি হল, মশাই? দই-বড়া কোথায়?'

সাধু বললেন, 'দই-বড়া এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। খুব ভালো দই-বড়াই আনছি। কিন্তু এ-কথাও বলে দিচ্ছি যে খেয়ে আপনাদের অনুতাপ হতে পারে!'

এমনি কথা শুনে সবাই হেসে উঠল, 'অনুতাপ হবে কেন? বেশি খেয়ে একটু অসুখ করলেও অনুতাপ হবে না!' সাধু তখন শূন্যে দু-হাত তুলে, আকাশের দিকে মুখ করে ডাকতে লাগলেন, 'আ-যা! আ-যা!' আর সঙ্গে সঙ্গে মস্ত এক হাঁড়ি

ভর্তি বড় বড় দই-বড়া শূন্য থেকে তাঁর হাতে এসে পড়ল। যেমনি চেহারা, তেমনি খোস্‌বো!

সবাই হাঁড়ির ওপর হুমড়ি দিয়ে পড়লেন। নিমেষের মধ্যে হাঁড়ি সাফ! বন্ধুরা তখন হাত-মুখ মুছে, চারদিকে চেয়ে সাধুকে দেখতে না পেয়ে, তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার গুণগান করতে করতে যে যার বাড়ির পথ ধরলেন।

কিছু দূর এগিয়েই একটা মেথর-পট্টি। সেখানে মহা সোরগোল। মনে হল কিছু একটা ঘটেছে। একটা ছোট ছেলে বেরিয়ে আসতেই সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? তোমাদের হলটা কি?'

ছেলেটা বলল, 'তাজ্জব কি ব্যাপার! আজ আমাদের দই-বড়া খাবার দিন। এককে-বার এককেজনের বাড়িতে দইবড়া হয়। আজ ফুফু খুব ভালো করে দই-বড়া করে, বড় হাঁড়ি করে এক জায়গায় রেখেছিল। তা হাঁড়িসুদ্ধ দই-বড়া উধাও! কোথায় গেল কেউ ভেবে পাচ্ছে না! তাই নিয়ে ঝগড়া লেগেছে!'

শুনে সকলের আক্কেল গুড়ুম!

এই গল্প শুনে আমাদের আরেকটা গল্প মনে পড়েছিল। সত্যি ঘটনা, বিবেকা-নন্দস্বামী আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে বলেছিলেন। জ্ঞানযোগ বইটিতে আছে। তাঁর ছাত্র বয়সের কথা। সাঁতরাগাছি কিম্বা ঐরকম কোথাও এক সাধু এসেছিলেন। সকলে বলত তাঁর অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, কিন্তু কাউকে কিছু দেখাতে চাইতেন না।

বিবেকানন্দ তখনো বিবেকানন্দ হননি। কলেজে পড়তেন, নাম নরেন দত্ত। সব কিছুকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। একজন সহপাঠী এসে বললেন, 'এইরকম এক সাধু এসেছেন। চল দেখে আসি বুজরুগি কি না।'

গেলেন তাঁরা। দেখলেন নাগা সন্ন্যাসী, গায়ে কাপড় নেই। এক ভক্তের ঘরে বসে আছেন; চারদিকে লোকজন। ভক্তও আছে, আবার অবিশ্বাসীও আছে। সবাই তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ দেখতে চায়। শেষটা তিনি বললেন, 'এ-সব দেখানো আমাদের উচিত নয়। তবু তোমরা অবিশ্বাস করছ বলে কিছু দেখাচ্ছি।'

ঘরে জায়গা নেই। সাধু বাইরে খোলা জায়গায় গিয়ে বসলেন। দর্শকরা চারদিক ঘিরে দাঁড়ালেন। পৌষ মাস, বেজায় শীত। দর্শকদের মধ্যে কার মায়া লাগল, সে তাঁকে একটা কম্বল দিল। সেটি গায়ে জড়িয়ে তিনি বসলেন।

তারপর ভিড়ের দিকে ফিরে বললেন, 'কি খাবে?' এক চ্যাংড়া ছোকরা বলে উঠল, 'ল্যাংড়া আম!' পৌষ মাসে ল্যাংড়া আম!

সাধু তেমনি শান্ত মুখে কম্বলের তলা থেকে রাশি রাশি ল্যাংড়া আম বের করে দিতে লাগলেন। এককেবারে পঁচিশ-ত্রিশটা করে। তাই দেখে সবাই হতভম্ব!

সাধুর সামনে ল্যাংড়া আমের পাহাড় জমে গেল। তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'খাও, খাও, খারাপ জিনিস নয় এ-সব!' সেদিন সবাই পেট ভরে ল্যাংড়া আম খেল। বহু দিন পর্যন্ত ঐখানে তার খোসা আর আঁটি পড়ে ছিল। কয়েকটা আঁটির

boiRboi.net

শেকড় বেরিয়েছিল পর্যন্ত।

কেউ বলল না যে সাধু সবাইকে সম্মোহিত করে ভোগা দিয়েছিলেন। ভোগায় আমের আঁটির কি কল বেরোয় ?

এ গল্প শুনে আমার ননদ বললেন, 'আশ্চর্য ঘটনা হামেশাই ঘটছে। আমাদের ব্যারাকপুরের বাড়ির একতলা ভাড়া নিল নিরীহ চেহারার একজন লোক। বলল— আপনারা শান্তি ভালোবাসেন ; তা আমাদের কুকুর বেড়াল গোরু মোষ টিয়া কাকাতুয়া বা ছেলেপুলে নেই। শুধু গিন্নি আর আমি ! যা বললেন না তা হচ্ছে তাঁদের ২২টা ট্রাকের ব্যবসা। দিনরাত হুড়মুড় ঘড়ঘড় দুমদাম ঘ্যাচর ম্যাচর ! আমাদের ঘুম শিকেয় উঠল আর আমার অমন হাজারি-কাঁঠালের গাছ, সে-ও কাঁঠাল দেওয়া বন্ধ করে দিল !!'

বিচিত্র গল্প

কত রকম গল্পই যে শোনা যায়, বই পড়বার দরকার হয় না। প্রেমেনবাবু শরৎচন্দ্রের একটা মজার গল্প শুনিয়েছিলেন। শরৎবাবুর উপন্যাসের কোথাও কোথাও ব্রাহ্মদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাঁর এক তরুণ ব্রাহ্ম ভক্ত ছিল। অনেক দিন সয়ে সয়ে শেষটা এক দিন সে বলেই ফেলল, 'দেখুন, আপনার সব লেখা পড়ে আমি বড়ই আনন্দ পাই, খালি ঐ ব্রাহ্মদের ঠেস্ দিয়ে কথাগুলো আমার ভালো লাগে না। আপনি কি বলতে চান সব ব্রাহ্মরাই খারাপ ?'

তাই শুনে জিব কেটে শরৎবাবু বলেছিলেন, 'না, না, ছি ! ছি ! তা বলব কেন ? আমি আর কটাকেই বা দেখেছি ?'

শুধু বিখ্যাত লোকদের কেন, সাধারণ মানুষদের বিষয়ে কত মজার গল্প শোনা যায়। আমাদের বন্ধু শিশু-সাহিত্যিক অজেয় রায় একবার কার্যব্যপদেশে কাটোয়া গিয়েছিলেন। দুপুরে স্টেশনের কাছে একটা ছোট কিন্তু পরিচ্ছন্ন হোটেলে উঠে দেখেন এক দম্পতিকে ভারি যত্ন করে খাওয়ানো-দাওয়ানো হচ্ছে।

তাঁরা যে পাড়াগাঁয়ের গেরস্ত মানুষ সে আর বলে দিতে হবে না। যিনি খাওয়াচ্ছেন, তিনি কিন্তু একজন চালাক-চতুর শহুরে ভদ্রলোক। মনে হল আপাততঃ কিঞ্চিৎ রুষ্ট। অথচ অতিথিদের নানা রকম উপাদেয় সামগ্রী ফরমায়েস দিয়েই

খাওয়াচ্ছেন এবং অপর্যাপ্ত পরিমাণে।

অতিথিরাও খাচ্ছেন খুবই প্রশংসনীয় ভাবে। স্বামীটি প্রকাশ্যে ভোজন করছেন, গিন্নিও ঘোমটার ফাঁকে খুব পেছিয়ে পড়ছিলেন না। যিনি খাওয়াচ্ছিলেন তিনি নিজে খাচ্ছিলেন না ; অতিথিদের সামনে অস্থির ভাবে পাইচারি করছিলেন আর থেকে থেকে ঘড়ি দেখছিলেন।

বলা বাহুল্য হোটেলের মালিকের আর কারো দিকে দৃষ্টি ছিল না। 'আরো দু-টুকরো মাছ দিই, মাসিমা, কেমন? ওরে, বড় দেখে চার পীস্ পোনা আন্!' পোনা এল ; সদ্ব্যবহার-ও হল। 'এবার দুটো চিংড়ির কাটলেট? ওরে ভোলা কোথায় গেলি, চারটে চিংড়ির কাটলেট!'

কাট্‌লেট এল ; অদৃশ্য হল। অজেয় বিমুগ্ধ নীরব দর্শক। নিজের খিদে-তেষ্টা, রেলের ধকল, সব ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। ঝাল চাটনি আর মিষ্টি আমসত্ত্বর অম্বল এল। তারপর লালচে চিনি-পাতা দই আর চার রকম মিষ্টি। আঁচাবার পর রূপোলী তবক-মোড়া ছাঁচি পান।

অজেয় সম্মোহিত দর্শক হয়ে থাকলেও, যিনি খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি একেবারেই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মুখে কিছু না বললেও, ইসারায় আর চোখ-পাকানিতে হোটেলের মালিককে কন্‌ট্রোল করবার চেষ্টা করছিলেন। মালিক তাঁর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিলেন না। একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আলগোছে কাঁধে হাত দিতেই, মালিক হাতটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, অতিথিদের পরিচর্যা করে চললেন।

অবশেষে এক সময় খাওয়াদাওয়া, আঁচানো, পান মুখে দেওয়া ইত্যাদি সব চুকল। হাঁড়িমুখে মালিক ৩৭ টাকার বিল্ চুকিয়ে দিয়ে, অতিথিদের নিয়ে রওনা দিলেন। তাঁদের দরজা অবধি পেঁছে দিয়ে, মালিক ফিরে এলেন।

তারপর অজেয়র কাছে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার। উনি হলেন গিয়ে নাম-করা উকীল। এঁদের দুজনকে সদরে নিয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কোন মক্কেলের পক্ষে সাক্ষী দিতে। তাই এত তোয়াজ! হ্যাঁ, বলুন স্যার! রান্না মন্দ হয়নি।'

সদর বলতেই শহরের কথা মনে পড়ল। 'রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছে শোনা। তিনি ভারি রসিক ছিলেন। কাজেই গল্পের কতটা সত্যি, এমন কি আদৌ সত্যি কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। ওঁদের আপিসের গল্প। আপিসের বড়-সায়েবের গল্প। নরেশ বলে একজন নিরীহ কেরাণী রবীন্দ্রলালের পাশেই বসত।

মেসে তার কাছে তার এসেছিল 'মাদার সীরিয়াস্। কম শার্প।' সাড়ে দশটায় আপিসে এসে ফ্যাকাশে মুখে রবীন্দ্রলালকে বলল, 'কি করি ব্রাদার? আমাকে ওষুধ-পত্র কিনে বাড়ি যেতেই হবে। বাগবাজার থেকে ছোট ভাইকে তুলব। একটায় ট্রেন। ছুটি করে নিতে হবে। তা বড়-সায়েব তো এখনো এলেন না!'

রবীন্দ্রলাল বললেন, 'অত ভাববার কি আছে? এ অবস্থায় ছুটি সর্বদা মঞ্জুর

হয়। তুমি ঐ টেলিগ্রামটা বড়-সায়েবের টেবিলের ওপর রেখে, বড়বাবুর কাছে একটা দরখাস্ত দিয়ে চলে যাও। সায়েব জিজ্ঞেস করলে, আমরা বলে দেব।'

নরেশ হাতে চাঁদ পেল। টেলিগ্রামটা বড়-সায়েবের টেবিলে রেখে সে চলে গেল। কেনাকাটা সেরে, ভাইকে নিয়ে যখন সে স্টেশনে পেঁছিল, তখনো গাড়ি ছাড়তে মিনিট পনেরো দেরি ছিল। বড়-সায়েবকে বলে আসা হয়নি বলে মনটা একটু খুঁৎখুঁৎ করছিল।

টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ দেখল একটা ফার্স্ট ক্লাস্ কামরায় বড়-সায়েব উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছেন। নরেশকে দেখে তিনিও অবাক্। 'দাশ! তুমি এখানে কেন?' নরেশ বলল, 'স্যার, মায়ের বড় অসুখ, তার পেয়ে বাড়ি যাচ্ছি। বড়বাবুকে বলে এসেছি, আপনাকে পেলাম না। কিন্তু আপনি এখানে কেন?' এক টেলিগ্রাম, 'মাদার সীরিয়স্ কম্ শ্যাপ।' না গিয়ে কি করি?

নরেশ বলল, 'স্যার, ওটা নিশ্চয় আমারি টেলিগ্রাম। আপনাকে না পেয়ে, আপনার টেবিলে রেখে এসেছিলাম। আপনি হয়তো তাড়াতাড়িতে আমার নাম দেখেননি।'

তাই শুনে বড়-সায়েব হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। 'উঃফ্! মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। এমনিতেই একটু খট্‌কা লাগছিল, কারণ আমার মা-তো কোন কালে মারা গেছেন! আচ্ছা, গুড্-বাই মাই বয়!'

এই বলে বড়-সায়েব তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেলেন।

জানোয়ার পোষা

শান্তিনিকেতনে এক শিল্পী ছিল, তার নাম প্রশান্ত রায়। তার স্ত্রীর নাম গীতা। তারা বড়ই জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসত। তাই বলে বড় বড় বিলিতী কুকুর, কিম্বা রংচং তোতাপাখি নয়। সে সব ওরা শান্তিনিকেতনে কোথায় পাবে?

একবার ঘোর গ্রীষ্মকালে বাইরে থেকে তেতে পুড়ে ওদের ঘরে এসে বসতেই, প্রশান্ত বলল, 'ইস্ গরমে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু পাখা তো চালানো যাবে না, এই হল মুশ্‌কিল!'

বললাম, 'চলছে না বুঝি? একাদশীকে ডেকে পাঠাওনি?' বলল, 'না না, খারাপ হয়নি।' 'তবে বুঝি কারেণ্ট নেই? কলকাতাতেও আমাদের ঐ এক জ্বালা!' 'কারেণ্ট আছে বৈকি। নইলে রেডিও চলছে কি করে?' 'তবে?'

'কি আবার তবে? পাখার হাঁড়িতে চড়াই-পাখি ডিম পেড়েছে। পাখা চালালে ডিম ভেঙে যাবে না? ডিম ফুটে ছানা বেরোক, তার ডানা গজাক—তার আগে পাখা চালাই কি করে?'

আরেকবার ঐ গরমেই বাইরে আগুনের হল্‌কা ছুটছে। দেখি সকলের বাড়ির সব দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ, খালি আমার বন্ধু প্রশান্তর বাড়ির একটা জানলা হাট করে খোলা। সেখান দিয়ে আগুনে হাওয়া হু-হু করে ঘরে ঢুকছে! এবার কি ব্যাপার? না, ঘুলঘুলিতে কাঠবেড়ালি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার পেতেছে। সব জানলা বন্ধ করলে তাদের আসা-যাওয়ার অসুবিধা হবে, শান্তিনিকেতনের জানলায় তো আর খড়খড়ি নেই।

শেষবার ঐ বাড়িতে গেলে, গীতা বলল, 'চটি খুলে পা গুটিয়ে বস।' আমি আপত্তি করতে লাগলাম, 'তা কেন? ওতে আমার অসুবিধে লাগে।' গীতা আমার পা থেকে চটি টেনে খুলে ফেলে, যত্ন করে ঠ্যাং দুটো তক্তাপোষের ওপর তুলে দিয়ে

বলল, 'যদি গিনিপিগের ছানাদের না দেখে মাড়িয়ে দাও?'

সব জন্তু-জানোয়ার, পাখি, পোকা-মাকড়কে ওরা ভালোবাসত। বোলতাদের অসুবিধা হবে বলে ঘরের কোণের ফুটবলের মতো বোলতার চাক ভাঙত না। ছেলে-পুলেদের হুল ফোটালেও না। উল্টে বলত, 'দেখলে ছেলেপুলেগুলো কি অসাবধান? একটা প্রাণী-হত্যা করাল! শুনেছি হুল ফোটালে সে বোলতাটা বাঁচে না!'

অবনীন্দ্রনাথের হাতে গড়া শিল্পী প্রশান্ত রায়। আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি এঁকে রেখে গেছে। যেমন পরিকল্পনা, তেমনি কারিগরি। দুঃখের বিষয়, খুব বেশি দিন বাঁচল না দুজনার মধ্যে কেউ। ষাট পেরুতে না পেরুতে স্বর্গে গেল।

অবিশ্যি অন্য লোকেও জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসে। যেমন আমার নবুকাকা। অবিশ্যি নবুকাকা তাঁর আসল নাম নয়। কিছু সত্যিকার কাকাও নন্ আমার। থাকতেন শান্তিনিকেতনের কাছে একটা ছোট শহরে। তার গা ঘেঁষে শাল-বন। আগে নাকি সেখানে বাঘের বাস ছিল। বনের পথ দিয়ে আসা-যাওয়া ছিল বিপজ্জনক।

তবে যখনকার কথা বলছি, তখন শিকারীদের, আর যারা বন কেটে বাড়িঘর বানিয়ে শহরের বিস্তার বাড়ায়, তাদের জ্বালায় বাঘের বংশ প্রায় নির্বংশ। যে-কটি বাকি

boiRboi.net

ছিল, তারাও অন্য ঘন বনে চলে গেছিল। অন্য ছোট জানোয়ার ছিল, শেয়াল, কুকুর, বন-বেড়াল, বেজি, ভাম। আমি নিজের চোখে একটা রোগা লম্বা লোমশ-ল্যাজ-ওয়ালা চকচকে ছাই রঙের শেয়ালকে ছুটে পালাতে দেখেছি।

একদিন সন্ধ্যায়, বসন্তকালে যখন শাল-গাছের ফুল ঝরে চারদিক সুগন্ধে ভুর-ভুর করছে, তখন নকুড় বলে ঝাস্-ড্রাইভার, পকেট থেকে এই এত্তটুকু একটা জানোয়ার বের করে, নবুকাকার হাতে দিয়ে বলল, 'মা-টি বোধ হয় চাপাটাপা পড়েছে। এখন একে দেখে কে? পথের পাশে কেঁদে সারা হচ্ছিল। বুনো-কুকুরের ছানা, দাদা! ভাবলাম বৌদির ছেলেপুলে বড় হয়ে গেছে, একে পেলে খুশি হবেন।'

রয়ে গেল বুনো-কুকুরের ছানা। নাম হল শিরোমণি। প্রথম প্রথম ঝুড়িতে খড়ের গাদায় শুত, পলতে করে দুধ খেত। পরে একটু বড় হলে, তক্তাপোষের তলায় চুপটি করে শুয়ে থাকত। বাড়িতে যা রান্না হত, চেটেপুটে তাই খেয়ে নিত। কোনো উপদ্রব ছিল না। সাড়াশব্দ দিত না। শিরোমণি বলে ডাক দিলেই বেরিয়ে আসত, খেয়েদেয়ে আবার খাটের নিচে। দিনে বড় একটা বাড়ির বার হত না। বনের জানোয়ারের ছানা, নেড়িকুত্তাকে বড় ভয়। রাতে জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে একবার টহল দিয়ে আসত। কোনো উপদ্রব করত না।

পাড়া-পড়শীরা গোড়ায় উদ্ভট চেহারার ছানা দেখে নানা মন্তব্য করতেন। পরে তাঁরাও চুপ করে গেলেন। কারণ তাঁদের লালু ভুলু বাঘা পপিদের চেয়ে শিরোমণি ঢের বেশি ভদ্র ছিল।

সবচেয়ে আপত্তি ছিল পাশের বাড়ির মুকুন্দবাবুর স্ত্রীর, অগত্যা তিনিও থামলেন। তারপরে একদিন হঠাৎ মহা চ্যাঁচামেচি, 'কে আমাদের শুকনো পাটকাঠি রোজ-রোজ সরায়?' ভদ্রমহিলা এই রকম বলেন আর আড়চোখে বারেবারে নবু-কাকার বাড়ির দিকে তাকান। শেষটা আর থাকতে না পেরে কাকিমা বললেন, 'বাছা, শিরোমণি কি উনুন ধরাবে যে তোমার পাট-কাঠি নেবে? অন্য জায়গায় দেখ।'

মাঝে কয়েকদিন গেল। তারপর আবার একদিন 'পাটকাঠি ফের কে নিল!' বলে চিৎকার! কাকিমা ওদিকের জানলা বন্ধ করলেন। ওদের সঙ্গে কথাবার্তাও।

সাত দিন বাদে পাশের বাড়িতে ফের চিৎকার—'কোথায় গেল অত বড় আম তেলের শিশিটা? এখানে তো টেকা দায় হয়ে উঠল দেখছি! কিছু রাখার জো নেই! না পাটকাঠি, না আম-তেল!'

এই রকম বাঁকা কথা শুনে রাগে নবুকাকার কান লাল হয়ে উঠল। এক মনে গড়গড়া টানতে টানতে, হঠাৎ নলটা নামিয়ে কাকিমাকে ডেকে বললেন, 'একবার খাটের তলাটা ভালো করে দেখ তো ছোটবৌ।'

অনেক কষ্টে বেতো হাঁটু মুড়ে বসে কাকিমা ঐ নিচু তক্তাপোষের তলায় উঁকি মারলেন। উঁকি মেরেই চক্ষুস্থির! খাটের নিচে রাশি রাশি পাটকাঠির মধ্যিখানে আম-তেলের শিশির ওপর থাবা রেখে, সগর্বে বসে আছে শিরোমণি! কাকিমার মুখে

boiboi.net

কথা নেই!

সেই রাতে সবাই ঘুমোলে পর, গায়ে কালো চাদর জড়িয়ে নবুকাকা এক রাশি পাট-কাঠি আর এক শিশি আম-তেল গভীর শালবনে রেখে এলেন। শিরোমণির গলায় দিনের বেলায় চেন্ পড়ল। সে কোনো আপত্তি করল না।

কিন্তু আরো কিছুদিন পরে যখন রাতে উঠে, দরজার দিকে মুখ করে পহরে পহরে ক্যা-হুয়া ক্যা-হুয়া রাজা-হুয়া রাজা-হুয়া বলে ডাকা ধরল, তখন তাকেও বনে ছেড়ে আসা ছাড়া উপায় রইল না। সেখানে সে সুখেই থাকত। ফিরবার চেষ্টা করেনি।

সরল মানুষদের ঘোরপ্যাঁচ

সেকালে লোকরা ধর্ম সম্বন্ধে যে আমাদের চাইতে অনেক বেশি সচেতন ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। ডাঃ দ্বিজেন মৈত্র ছিলেন নাম-করা অস্ত্র-চিকিৎসক। তাঁর শ্বশুরমশাই সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নেবার পরে ত্রিশ বছর পেনশন ভোগ করেছিলেন। সেটা নাকি চাকরির চেয়েও বেশি দিন।

তাঁর বাড়ির চাকর-বাকররা অনেকে তাঁর প্রভাবে পড়ে ব্রাহ্ম হয়েছিল। নিজেই তাদের খরচপত্র করে ব্রাহ্মমতে বিয়ে-থা দিতেন। শুনেছি একবার তাঁদের ঝিয়ের সঙ্গে পাচকের বিয়ে হচ্ছে। নিজেই আচার্য হয়ে, যেমন ব্রাহ্ম বিয়েতে বলে, পাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'শ্রীমান পাঁচকড়ি তুমি কি এই পবিত্র উদ্বাহ ব্রতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছ?' সে মহা বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'প্রস্তুত হইসি না তো আইসি ক্যান্?'

আমাদের বাড়িতেও যারা কাজকাম করত, তারা মাঝে মাঝে সরল মনে বেশ মজার কথা বলত। একবার দেখা গেল খৃশ্চান বেয়ারা খৃশ্চান রাঁধুনের হাতে খেতে রাজি নয়। কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, 'সে কি করে খাব? ওর যে ছোট জাত।'

আমার বাবা অবাক হলেন, 'তোমরা না খৃশ্চান?' বেয়ারা বলল, 'খৃশ্চান হয়েছি বলেই কি বাপ-পিতেমো'র ধম্ম ছাড়তে হবে?'

আমাদের খৃশ্চান আয়ার সঙ্গে হিন্দু বেয়ারার একবার তর্ক হওয়াতে, আয়া এল নালিশ করতে, 'নারাণের আক্কেলটা দেখলেন, মা? বলে নাকি লক্ষ্মীঠাকরুণ হিঁদুদের দেবতা!' আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'ঠিক-ই বলে আমোদিনী, উনি

হিন্দুদের দেবতা!' আয়া চটে গেল, 'তা বললেই তো মানবনি, মা। আমরা হলাম গিয়ে চার পুরুষের খিশ্টান। আমরা বরাবর ঘটা করে এসেছি এ-কথা কে না জানে! এর পর নারাণ হয়তো বলবে যে খিশ্টানদের তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতে নেই। হুঃ!'

খাওয়া-শোয়ার মতো স্বাভাবিক ভাবে ধর্মটাকে নেয় এরা। ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে যায় না। সহজ বুদ্ধি যা বলে তাই করে। মধুপুরে আমার ভাসুরের মালির একটা ক্যাবলা ছেলে ছিল। তাকে দিয়ে বাগানের কোনো কাজই করানো যেত না। তবে রান্নাটা পারত। কিন্তু জল-চল জাত নয়; বাড়িতে গোঁড়া আত্মীয়স্বজন ছিলেন; কাজেই রান্নাঘরের কাজও দেওয়া যেত না। ছেলের বাপ দিনরাত তাকে যা নয় তাই বলে বকাবকি করত। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা পালিয়ে গেল।

এর অনেক বছর পরে আমার জা পুজো দেখতে কাশীতে একজনদের বাড়িতে গেছেন। নিজেদের মন্দির, ঘটা করে গৃহ-দেবতার পুজো হয়। সেখানে গিয়ে শুনলেন যে অনেক দিন পরে ভোগ রাঁধবার জন্য একজন ভালো বামুন-ঠাকুর পাওয়া গেছে।

পুজোর পর সেই বামুনের রান্না খেয়ে সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগলেন। আঁচাবার সময় তার মুখ দেখেই দিদি তাকে চিনতে পারলেন। এ তো সেই মালির ছেলে ছাড়া কেউ নয়!

এতগুলো লোকের কি রকম মনের ভাব হবে, সে কথা ভেবে দিদি কিছু বললেন না। নিজে সব বিষয়ে ভারি উদার ছিলেন। গলির মুখে কিন্তু সেই ছোকরা এসে

boiRboi.net

তাঁর পায়ে পড়ল। 'খেতে পেতাম না, মা, তাই বাধ্য হয়ে বামুন হয়ে গেলাম। ওনাদের বলে দিলে বাকি মাইনে তো দেবেনই না, তার ওপর ঠেঙিয়েই মেরে ফেলবেন।'

দিদি বললেন, 'তাহলে আজ-ই বিকেলে মায়ের অসুখ বলে, বাকি মাইনে নিয়ে বাড়ি চলে যা। সন্ধ্যায় এসে যেন দেখতে না পাই।'

ছেলেটার জন্য কেমন মায়া লাগল। 'হ্যাঁরে, তোর বামুন হবার কি দরকার? এত ভালো রাঁধিস্, এমনিতেই লোকে তোকে লুফে নেবে। তুই বরং গিরিডিতে আমাদের বেয়াইমশায়ের বাড়ি চলে যা। তাঁরা তোকে চেনেন। রান্নার লোক খুঁজছেন শুনেছি।'

এই রকম সরল মানুষদের ঘোর-প্যাঁচে সংসারটা ভরতি। সব দেশেই তাই। যারা লেখা-পড়া জানে না, তাদের অনেক সরল বিশ্বাস থাকে। কিছুদিন আগে বিলেতের একটা মজার ঘটনার কথা কাগজে পড়েছিলাম। ওখানকার ব্যবস্থা বড় চমৎকার। ৬৫ বছর বয়স হলে, নাগরিকরা বুড়ো বয়সের বিশেষ পেন্‌শন পায়। যাতে না খেয়ে কেউ না মরে। এই রকম দুই পেনশন-ভোগী বুড়ি একসঙ্গে থাকত। তাদের মধ্যে ভারি ভাব। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে তাদের ঘরকন্না। এক বুড়ির পায়ে বাত, চলে-ফিরে বেড়ানোই দায়। শেষটা অনেক লেখা-লেখি করে, বাড়িতে সরকারি ইন্সপেক্টর আনিয়ে, খোঁড়া বুড়ির পায়ের অবস্থা দেখিয়ে, এই ব্যবস্থা হল যে ছোট বুড়িই প্রতি সপ্তাহে গিয়ে দুজনার পেনশন তুলে আনবে।

এই ব্যবস্থাই বছরের পর বছর ধরে চলতে লাগল। বারো বছর পরে এক দিন ছোট বুড়ি পেনশন আনতে গিয়ে দেখে তার জন্য পুলিসের লোক অপেক্ষা করছে। কে তাদের বলে দিয়েছে খোঁড়া বুড়ি দশ বছর হল মারা গেছে আর ছোট বুড়ি দু-জনার পেনশন্ বে-আইনী ভাবে একা ভোগ করছে। কাজেই আইন মতে তাকে ধরে হাজতে পোরা যায়!

শুনে সে তো কেঁদেকেটে এক-সা করল। কোনো বে-আইনী কাজ সে করেনি। দুজনার পেন্‌শন্ সে একা দশ বছর ভোগ করছে সত্যি, কিন্তু খোঁড়া বুড়ি মারা যাবার আগে তার পেন্‌শন্‌টি উইল্ করে ছোট বুড়িকে দিয়ে গেছে! এই তো সেই উইল্, খোঁড়া বুড়ির নিজের হাতে লেখা। পাড়ার দু-জন বন্ধু সাক্ষী হয়ে সই দিয়েছে। পরের জিনিস সে নিতে যাবে কেন? প্রতি রবিবার সে গির্জে যায়!

পেন্‌শন্ আপিসের কর্মচারীরা মহা মুশ্‌কিলে পড়লেন। ৭৭ বছরের বুড়ি, তার সত্যিই বিশ্বাস বন্ধুর পেন্‌শন্ তার-ই প্রাপ্য! কোনো কল্যাণ-সমিতির দয়ায়, শেষ পর্যন্ত তাকে হাজতে যেতে হয়নি। তবে বন্ধুর পেন্‌শন্-ও আর পায়নি।

boiRboi.net

ঠকিয়ে খাওয়া

আমাদের দেশের কত অখ্যাত লোক যে আসলে কত বুদ্ধি ধরে, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেছিল। দুঃখের বিষয়, সুযোগের অভাবে বুদ্ধিগুলো প্রায়ই বে-আইনী ভাবে প্রযুক্ত হওয়াতে, তার অধিকারীদের যথা-যোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অবিশ্যি বে-আইনী কাজের চমৎকারিত্বেরও যে একটা মনোহর দিক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সব চমৎকার ঘটনাকে ঠিক বে-আইনীও বলা উচিত নয়।

বিশ্বভারতীর পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের বিষয়ে একটা গল্প আছে, যেটা তাঁর আপনজনরা অস্বীকার করলেও, সে এমনি চমৎকার যে বানানোও যদি হয়, তবু বার বার বলা চলে। একবার তাঁর নিতান্তই কলকাতায় যাওয়া দরকার, অথচ বোল-পুর স্টেশনে এসে দেখেন গাড়িতে তিল ধরার জায়গা তো নেই-ই, উপরন্তু ঠিক সেই সময় গার্ড সবুজ নিশান গুটিয়ে নেওয়াতে গাড়ি-ও গুটি-গুটি চলতে শুরু করে দিল।

নেপালবাবু আর কি করেন, অগত্যা বাধ্য হয়ে গার্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে গাড়ির সিঁড়ির ওপর থেকে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে নিলেন। সে-ও প্রাণপণে লাল নিশান নাড়তে আর সিটি বাজাতে লাগল। গাড়ি থামল। দুজনে উঠে পড়লেন। আবার সবুজ নিশান দেখানো ও গাড়ি ছাড়া। গার্ডের গাড়িতে তাঁদের দুজনার মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু বলতে পারলাম না।

আরেকবার আমার এক জামাইবাবু প্রায় গাড়ি ফেল্ করেন-করেন, এমন সময় তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধি বন্ধুরা তাঁকে এক রকম কোল-পাঁজা করে গার্ডের গাড়িতে ছুঁড়ে দিলেন। বলা বাহুল্য গার্ড মহা খাপ্পা! 'জানেন, এ-রকম বিপজ্জনক বে-আইনী কাজ করার জন্য আপনার চাই কি একশো টাকা জরিমানাও হতে পারে?'

জামাইবাবু সে-কথার উত্তর না দিয়ে, চোখ লাল করে বললেন, 'আমার কষ্ট করে রাঁচি থেকে আনানো লিচুগুলো তুমি খেয়ে ফেলছ কেন?' ফিরিঙ্গি গার্ড ফিক্ করে হেসে বলল, 'ডোণ্ট মাইণ্ড স্যার। এই দেখুন যথেষ্ট আছে, যথেষ্টর চেয়ে বেশিই আছে।' এই বলে পাশের ঝুড়ির ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে মুঠো মুঠো লিচু বের করে জামাইবাবুর ঝুড়ির ফাঁক তো ভরেই দিল, উপরন্তু তাঁকে এত লিচু খাওয়াল যে তিনি গলে জল। একেই বলে বে-আইনী কাজের মনোহর-দিক।

সব সময় অবিশ্যি মনোহর দিকটা প্রকট হয় না। সেকালে আরা স্টেশনের দো-আঁশলা স্টেশন-মাষ্টার নানা বিচিত্র উপায়ে মেলা কাঁচা টাকা জমিয়েছেন। এমন

সময় এক সাগরেদ এসে খবর দিল, 'একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলবেন স্যার। যারা ভাগে কম পেয়েছে, তারা কিন্তু চুক্‌লি করেছে।'

সায়েব পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। এই ছোট জায়গার মধ্যে টাকা লুকোবার নিরাপদ জায়গা কোথায়? কাউকে বিশ্বাস-ও করা যায় না, যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরছে। তখন প্রাণের বন্ধু ঘোড়ার ডাক্তার পিন্টো একটা বুদ্ধি দিল। 'একটা কাজ কর। নোটগুলোকে কাগজে মুড়ে একটা ছোট প্যাকিং কেসে ভরে, আচ্ছা করে স্ক্রুপ্‌ এঁটে বন্ধ কর। ওপরে লিখে দাও 'নেল্‌স্‌ ওন্‌লি'—পেরেক ছাড়া কিছু নয়। তারপর দাও পাঠিয়ে মেমের কাছে।'

সায়েব হাতে চাঁদ পেলেন। 'এতই যদি করলে, ম্যান্‌, আরেকটু কর। আমি সব প্যাক্‌ট্যাক্‌ করে দিচ্ছি, কিন্তু পার্সেলটা তুমিই করে দিয়ে এসো। আমি ওটার সঙ্গে জড়িত হতে চাই না। বলা যায় না, যদি কারো চোখে পড়ে যাই। তোমরা তো হরদম ঘোড়ার নাল, পেরেক ইত্যাদি পাঠাও।'

অগত্যা তাই করা হল। পিন্টো বেনামার রসিদ এনে সায়েবকে দিয়ে গেল। সামান্য একটু তদন্ত হল। বলা বাহুল্য কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সব চুকে গেলে পর, হন্তদন্ত হয়ে সায়েব গোমো গিয়ে মেমকে জিজ্ঞাসা করল, 'পার্সেল পেয়েছিলে তো?'

মেম মহা খাপ্পা, 'আচ্ছা, প্যাকিং-কেস বোঝাই পেরেক পাঠাবার মানেটা কি? আমি ভাবলাম না জানি কি এসেছে!' সায়েবের মুখ চুণ! কোনো কথা ভেঙেও বলা গেল না। ডিউটিতে ফিরে গিয়ে শুনল প্রাণের বন্ধু পিন্টো পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে গোয়া না কোথায় চলে গেছে!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। মাঝখান থেকে বুদ্ধিমানরা দু-পয়সা করে নিয়েছিল। ব্রিজের গল্পটা শুনেছেন? ব্রিজ মানে তাস-খেলা নয়? স্রেফ যাকে বলে সাঁকো বা পুল, সেই ব্রিজ। তখন যুদ্ধ খুব ঘোরেল হয়ে এসেছে। মিলিটারির স্থাপত্য-বিভাগ চোখে-মুখে পথ দেখছিল না। প্রাইভেট কণ্ট্র্যাক্টর লাগাতে হচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ। টাকাকড়ি নিরাপদে রাখাও এক মহা সমস্যা।

থেকে থেকেই শোনা যেত—ঐ জাপানীরা এল! ঐ দিশী বিদ্রোহীরা এল! বর্মার পাহাড় ফুঁড়ে এই এসে পড়ল বলে! তাদের ঠেকাবার জন্য সাঁজোয়া বাহিনী যাবে! কিন্তু যাবার পথ কই? নদী পার হতে হবে, সাঁকো কই? সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্য বিভাগ তৎপর হয়ে উঠত। কাঁচা পথ পাকা কর। ভাঙা পথ জোড়া দাও। নেই-পথ তৈরি কর। লড়বে অ্যামেরিকান বাহিনী। পদাধিকারীদের কাছে হুকুম এল বাড়তি কণ্ট্র্যাক্টর লাগিয়ে যেমন করে হোক, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ব্রিজ সব তৈরি করে ফেল। টাকার জন্য ভাবতে হবে না।

সেই সময় উত্তর-পূর্ব বাংলায়—জায়গার নাম বলা তখন বারণ ছিল, এখন ভুলেও

গেছি—একটা মাঝারি নদীর ওপর মজবুত ব্রিজ্ বানাতে হবে। অর্ডার, নক্সা, টাকা-কড়ি এসে গেল। ব্যস্ জিনিসপত্র জোগাড় করে তৈরি করে ফেললেই হয়ে গেল। সেখান থেকে সীমান্তের দূরত্ব কাগ-ওড়া কুড়ি মাইল। কাছাকাছি জন-বসতি নেই।

পদাধিকারী ব্যস্ত হয়ে কণ্ট্র্যাক্টরকে বললেন, 'তাহলে কাজটা শুরু করে দিন, কি বলেন? টাকাও যখন এসে গেছে।'

কণ্ট্র্যাক্টর বললেন, 'এত কিসের তাড়া, দাদা? ও-পথে কখনো শত্রুর আসে? কে না জানে ওটা হল গিয়ে ভূত-প্রেতের রাজ্য? কাজ করবার একটা মানুষ পাবেন না। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি কিসের?'

এমনি করে সপ্তাহ যায়, মাস যায়, ব্রিজের কাজও শুরু হয় না, টাকাও শেষ হয়। এমনি সময় এক দিন হন্তদন্ত হয়ে পদাধিকারী গিয়ে কণ্ট্র্যাক্টরের ক্যাম্পে হাজির

boiRboi.net

হলেন। 'সর্বনাশ হয়েছে, মশাই! ইংরেজ কম্যাণ্ডার আসছে ব্রিজ্ পরিদর্শন করতে। এদিক দিয়ে নাকি শত্তুর আসবে না, কিন্তু আমাদের সাঁজোয়া বাহিনী এগোবে শত্তুরকে আক্রমণ করতে!!'

কণ্ট্রাক্টর চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বললেন, 'অত ভাবনা কিসের, দাদা? লিখে দিন অর্ডারের ভাষার অস্পষ্টতার দরুণ ব্রিজ্টা এখানে না করে, হিমালয়ের পাদ-দেশে একটা ছোট নদীর ওপর করা হয়েছে। অ্যাওয়েটিং ফার্দার অর্ডার্স। ব্যস্। চুকে গেল!'

হল-ও তাই। তবে ঠিক চুকে গেল না। মিলিটারি থেকে দু-গুণ টাকা এল। যথাস্থানে সত্বর নতুন ব্রিজ্ তৈরি হোক, দিন রাত মজুর লাগাও। তার জন্যে বাড়তি টাকা। আর ভুল জায়গার ব্রিজের ওপর দিয়ে সুবিধা পেয়ে যদি জাপানীরা হানা দেয়, তাই সেটা ভেঙে ফেলার জন্যে এই এই টাকা!

বলা বাহুল্য সেই নেই-সাঁকো ভেঙে ফেলার টাকার অবিলম্বে সদ্গতি হল। আর ঠিক জায়গায় সাঁকো তৈরি করার আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। মিলিটারি তখন অন্যান্য আরো জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ব্রিজের জন্য দেওয়া ঐ সামান্য দশ-পনেরো লাখ টাকার হিসেব-ও কেউ দেখতে চাইল না।

গরীবের ঘোড়া-রোগ

আমার শ্বশুর বাড়ির দেশের গ্রামে এক জমিদার ছিলেন, তাঁর মা নাকি ভারি দয়ালু। কেউ তার ছেলেমেয়ের বিয়ে, বা মা-বাপের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে, বাড়ির দুটো কলা-মুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে এলে, তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে কত আশীর্বাদ করতেন আর বলতেন, 'আহা, বেঁচে থাক, সুখে থাক, আমার সতীশচন্দ্রের দোরে চিরকাল খেটেখুটে খেও!' প্রজারা কৃতার্থ হয়ে বাড়ি যেত।

আরেক জমিদার ছিলেন, তিনি কারো বারণ না শুনে ছেলেকে স্কুলে ভরতি করে দিলেন। গাঁয়ের স্কুল নয়; সেখানে যত রাজ্যের চাষাভুষোর এবং তাঁর নিজের সেরে-স্তার মুহুরি, দপ্তুরির ছেলেরা পড়ত। তাদের সঙ্গে তো ছেলেকে বসতে দেওয়া যায় না।

তাই তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, মামার বাড়িতে থেকে, হিন্দু স্কুলে পড়ুক।

boiRboi.net

তাঁর ছেলের প্রাণের বন্ধু মুহুরির ছেলে পাশের গাঁয়ের বড় স্কুলে ভরতি হল। মোসায়েবের মুখে সে কথা শুনে জমিদার রেগে গেলেন, 'যত্ত সব বাড়াবাড়ি! কেন, গাঁয়ের পাঠশালাটা কিসে খারাপ হল? দেখিস্ তোরা, ওকে পাঠশালার গণ্ডী পার হতে হবে না!'

কয়েক বছর পরে জমিদারের ছেলেকে হিন্দু স্কুল থেকে ছাড়িয়ে, মামার বাড়ি থেকে সরিয়ে, কুষ্ঠিয়ার বোর্ডিং-এ রাখা হল। কলকাতার ছেলেরা নাকি ভারি খারাপ। মামাও আর ছেলেকে রাখতে চাইছেন না।

জমিদার বললেন, 'সিরেফ হিংসে। আমার জগদীশ সর্দি-কাশিতে এমনি ভুগল যে মন দিয়ে বার্ষিক পরীক্ষাটা দিতে পারল না। দিলে আটকে মাস্টারগুলো! এর ফলে মামার ছেলেও জগদীশের ক্লাসে উঠে এল। পাছে সে জগদীশের চেয়ে কম নম্বর পায়, তাই শালা বলে পাঠিয়েছেন—ও ছেলে রাখা আমার কম্ম নয়।

মোসায়েব বললেন, 'এই তো ভালো, কত্তাবাবু। কাছে-পিঠে থাকবে, আনা-নেয়া করতে পারবেন!'

আরো দু-বছর বাদে বোর্ডিং ছেড়ে জগদীশ বাড়িতে এসে বসল। হেডমাস্টার নাকি ভারি খারাপ। ওর অসুবিধা বোঝে না।

মোসায়েব বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, কত্তাবাবু, ওকে তো আর পরের দোরে চাকরি করে খেতে হবে না। এমন জমিদারি রয়েছে। একটা বাড়ির মাস্টার রেখে দিন, তাতেই হবে। আমার ভাইপোটা তো ম্যাট্রিক পাস করে, সেই ইস্তক বসেই আছে।'

জমিদার বললেন, 'বেশ। আচ্ছা ঐ ব্যাটা মুহুরীর ছেলেটার কি হল? তার সঙ্গে মিশে আমার ছেলেটা না আবার বয়ে যায়!'

মোসায়েব বললেন, 'না, না, সে ভয় নেই। সে ব্যাটা এবার মধ্যশিক্ষায় পরীক্ষা দিয়েছে। চমৎকার নৌকো বায়।'

জমিদার বললেন, 'হে হে তাই নাকি? পাস্ নিশ্চয় করতে পারবে না, তা না হয় মাঝিগিরি করে খাবে!'

মোসায়েব বললেন, 'না কত্তামশাই, পাস্ করে সে জলপানি পেয়ে কুষ্ঠের ইস্কুলে ভরতি হয়েছে। ডেপুটি সায়েব ওর নৌকো বাওয়া দেখে খুশি হয়ে সোনার মেডেল দেছেন।'

জমিদার বললেন, 'হুঁম!'

আরো কয়েক বছর গেল। ছেলেকে সামলাতে না পেরে, কড়া শ্বশুরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, জমিদার তাকে পাঠিয়ে দিলেন খিদিরপুরে, শ্বশুরের কুঠিবাড়িতে কাজ শিখতে।

সন্ধ্যাবেলা মোসায়েবকে বললেন, 'এত দিনে সে হতভাগা নিশ্চয় জেলে গেছে? পিঁপড়ের পাখা উঠলে যা হয়।'

মোসায়েব বললেন, 'আজ্ঞে না, কত্তাবাবু, সে ম্যাট্রিক পাস করে জলপানি পেয়ে,

boiRboi.net

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছে।'

কত্তা একটু গরম হলেন, 'তা পড়তে পারে। ছোটলোকের ছেলে সিরেফ কপাল-জোরে এতটা উঠেছে। বি-এ পাস্ ওকে করতে হবে না দেখো।'

আরো চার বছর পরে, মোসায়েব এক দিন নিজের থেকে বললেন, 'ও কত্তামশাই, ঐ যে অনুকূল মুহুরি, যার ছেলের বড্ড বাড় বেড়েছে বলে আপনি চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিলেন, তার সেই ছেলে বি-এ পাস্ করে পাঁচশো টাকার পুরস্কার আর সোনার মেটেল পেয়েছে। এম্-এ পড়ে আর মাসে মাসে বাপকে মাইনের ডবল টাকা পাঠায়।'

জমিদার কাষ্ঠ হাসলেন, 'তা পেতে পারে। কিন্তু ছোটলোকের ছেলে তো, চাকরি-বাকরি পাবে না। এই আমি বলে দিলাম।'

আরো বছর দুই পরে মোসায়েব বললেন, 'ও কত্তা, সেই ছোকরা সব-ডেপুটি হল!'

জমিদার বললেন, 'হে হে ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরের সব-ডেপুটি হয়ে কি আমাদের মাথা কিনে নেবে? ব্যাটা খোসামুদে কোথাকার!'

মোসায়েব বললেন, 'তা নয়, কত্তা, সে যে ডেপুটি হয়ে, আমাদের কুষ্ঠেতেই আসছে!'

pathagar.net

জমিদার আঁৎকে উঠলেন, 'অ্যাঁ বল কি! ব্যাটার তো কম আস্পদ্দা নয়!'

তারপর কিছুক্ষণ থুম হয়ে বসে থেকে, শেষটা বললেন, 'তাহলে ব্যাটা নিশ্চয় মরে যাবে!'

জাঁ এরবের

বিদেশীদের ব্যাপার-ই আলাদা। দেশ স্বাধীন হবার ১০ বছর আগে যে সমস্ত সায়েব-মেমরা ভারতে আসত, তারা আজকালকার ট্যুরিস্ট আর হিপিদের থেকে একেবারে আলাদা ছিল। একদল আসত রাজ্য-শাসন করতে কিম্বা ধনের আশায়। আমি তাদের কথা বলছি না।

আমি যাদের কথা বলছি, তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শান্তশিষ্ট পড়ুয়া টাইপের ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ-দেশের শিল্প, সাহিত্য বা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করা। তারা আগে থেকেই নিজেদের তৈরি করে আসত। নাম-করা সব সংস্থার, বা বিখ্যাত ভাষাবিদ্‌দের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র আনত। অনেক সময় আমাদের বন্ধুদের বন্ধুদের ব্যক্তিগত চিঠি আনত। কেউ কেউ সংস্কৃত, পালি, বাংলা পড়তেও পারত।

এখনো যারা আসে তাদের মধ্যেও হয়তো ঐ ধরনের কিছু মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই বোধ হয় অনেক পুরনো নিয়ম বদলে গেছে। এখন আর ওদের দেখতে পাই না। এক যারা সরকারি সূত্রে আসে। তারা অন্য জাত।

মনে আছে ১৯৩৬ সালে পণ্ডিচেরি থেকে আমাদের ভাগ্নে দিলীপকুমার রায় চিঠি দিয়ে জাঁ এরবের বলে এক ফরাসী ভদ্রলোককে আমাদের কাছে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন তিনি আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি আমুদে মানুষটি। ৬ ফুটের বেশি মাথায়, বলিষ্ঠ শরীর, চোখেমুখে কথা বলতেন নিখুঁত ইংরিজিতে। বয়স ৪০-৪২ হবে।

মাসখানেক ছিলেন আমাদের কাছে। রোজ হয় বেলুড় মঠে, নয় উদ্বোধন আপিসে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দ স্বামীর জীবন নিয়ে গবেষণা করছিলেন। বই লেখা হবে। বলতেন ওঁদের দেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত আছে।

সারা দিন দেখা পেতাম না। সন্ধ্যায় ফিরে ঠাণ্ডা জলে চান করে, খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, কৌচে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে রাজ্যের গল্প করতেন। ঘুরতে কোথাও বাকি রাখেননি, বিশেষ করে তিব্বত, চীন, জাপান।

এমন সরস-গম্ভীর মানুষ কম দেখেছি। নিরামিষ খেতেন। রোজ সকালে আসনে বসে ঘণ্টাখানেক ধ্যান করতেন। বলেছিলেন, এক সময় বিবেকানন্দ স্বামী ঐ আসনে বসে ধ্যান করতেন। বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল।

আরেকবার সাহেবের শাদা খদ্দরের পাঞ্জাবীতে এক সেট্ বড় বড় রুপোর বোতাম দেখেছিলাম। সে-ও নাকি স্বামীজির ব্যবহার করা, কেউ দিয়েছিল তাঁকে। এ-সব জিনিস ফ্রান্সে ওঁদের সাধনা-কেন্দ্রে এখন রাখা হবে। বড় মন-কেমন করে উঠেছিল।

বলেছিলাম, 'আমি হলে কাউকে ও-জিনিস বিদেশে নিয়ে যেতে দিতাম না।' হেসে বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস্ আপনার হাতে অনুমতি দেবার ভার নেই। কিছু ভাববেন না। যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানেও এ জিনিস কিছু কম শ্রদ্ধা পাবে না।'

ভারি দুঃসাহসী মানুষটি। ধর্মগ্রন্থের খোঁজে তিব্বত গিয়েছিলেন। বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোনো শাদামুখো মানুষ তিব্বতে পদার্পণ করতে পারতেন না। তাই তিব্বত গেছিলেন শুনে আমার ভারি কৌতূহল হয়েছিল। আমার দাদামশাই গেছিলেন ১৮৯৯ নাগাদ। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী এবং তীর্থযাত্রী, তবে দুঃসাহসিকও বটে। দাদামশাই তিব্বতের নানা গুম্ফায় তিব্বতী হরপে লেখা দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথি আর তার অনুবাদ দেখে এসেছিলেন শুনে সায়েবের ভারি আক্ষেপ। তিনি সে রকম সুযোগ পাননি।

তারপরেই মুচকি হেসে বললেন, 'কিন্তু আমার যেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল, দাদা-মশায়ের নিশ্চয়ই তা হয়নি। সীমান্ত পেরিয়ে এক সরকারি পান্থশালায় উঠেছি। কাছে-পিঠে দু-একটি গুম্ফা দেখেছি, দুচারজন লামার সঙ্গে আলাপ করেছি। তারপর গাইড্ বলল, "এখানকার পান-শালা না দেখলে কিন্তু কিছুই দেখা হল না।"

গেলাম পান-শালা দেখতে। লোকের ভিড়। পান-শালা মানে স্রেফ মদের আড্ডা। ফ্রান্সেও যেমন, ওখানেও তেমনি, মদকে লোকে ঘেন্না না করলেই হল। সব শীতের দেশেই এই নিয়ম।

পান-শালায় ক-জন মহিলা ছিলেন তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সবার একরকম পোষাক, এক রকম চেহারা, দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই। ভীষণ শীত। আংটায় কাঠ-কয়লা জ্বলছে। হাসি, গল্প, বাঁশের চোঙে কিম্বা পিতলের গেলাসে মদ খাওয়া।

গোড়ায় কেউ কোনো অসভ্যতা করছিল না। কিন্তু রাত যতই বাড়তে লাগল, কারো কারো মাথাও গরম হয়ে উঠতে লাগল। জোরে জোরে কথা থেকে তর্কাতর্কি, তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে ছোরাছুরি বেরোতে কতক্ষণ?

ভাবছিলাম আমি বিদেশী, এ-সবের মধ্যে না থাকাই ভালো। গাইড্ বলল,

BanglaBook.net

ব্যস্ত হবেন না। এখানে শান্তিরক্ষার ভালো ব্যবস্থা আছে। শান্তিরক্ষক এই এল বলে!'

যা বলেছিল ঠিক তাই! হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে একজন ইয়া ষণ্ডা বেঁটে শান্তিরক্ষক—ইংরিজিতে যাকে বলে চাকারআউট—এসে দুই হট্টগোলকারীর ঘাড় দুটো দু-হাতে ধরে, তাদের পেছনে লাথি মারতে মারতে, সামনের খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এল!

তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে যখন আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, তখন দেখলাম সে একজন ৪০-৪৫ বছর বয়সের মেয়ে-মানুষ। স্ত্রী-স্বাধীনতায় ওরা পৃথিবীর সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে।'

চীন দেশেও গেছিল সায়েব। সেখানে এক নির্জন গ্রামে, কালো তাঁবুতে রাতের আশ্রয়। গাইড্ পর্যন্ত সঙ্গে ছিল না। ঘোড়াওয়ালাও ওঁকে তাঁবুর সামনে নামিয়ে

boiRboi.net

দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। ঐটাই নাকি পান্থশালা।

তাঁবুর মালিকের চেহারা দস্যুর মতো বললে কম বলা হয়। স্রেফ্ দৈত্যের মতো দেখতে। মাথায় সায়েবের চেয়েও লম্বা। ঝুলো গোঁফ, মুখে ভাবের লেশমাত্র নেই, কানে জেডের গয়না। প্রাণ হাতে করে সায়েব তাঁবুতে বসে ভাবছিলেন খিদেয় প্রাণ যায়, কিন্তু খাবারের আশা কম। এমন সময় লম্বা একটা ছোরা হাতে একজন লোক ঘরে ঢুকে, চোখ পাকিয়ে হিড়িং মিড়িং করে কি সব বলে গেল, সায়েব এক বর্ণও বুঝলেন না।

শেষটা একবার চারটে আঙুল, একবার দুটো আঙুল দেখিয়ে কি যেন জানতে চাইল। সায়েবের চক্ষুস্থির! নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করছে চার দিন পরে গর্দান নেওয়া হবে, নাকি দুদিন পরে। ভয়ে ভয়ে সায়েব চারটে আঙুল দেখাতেই, সে ছুটে বেরিয়ে গেল। এবং একটু বাদেই একটা সুন্দর চীনে-মাটির থালায় একটা মোটা হাত-রুটি, এক দলা মাখন আর চারটে মস্ত মস্ত সেদ্ধ ডিম নিয়ে এল!

বুটু ও পটোদিদি

আমার পটোদিদির গল্প আগেও করেছি। পটোদিদির মেয়ে বুটু, বুটুর মেয়ে মালবিকা। আমার নাতনি মালবিকা কাননের গানের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তাকে সবাই চেনে। যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি মিষ্টি চেহারা আর স্বভাব। তার ওপর গল্প যা বলে সে শুনতে হয়। এ-গল্প তার কাছে থেকেই পাওয়া, প্রায় তারি ভাষায় বলা।

হয়তো পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। পটোদিদি বুটুকে নিয়ে রাতের গাড়িতে কোথায় যেন চলেছেন ছুটি কাটাতে। সেকালের সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি ; মেয়েদের কামরা ; তাতে পটোদিদি আর বুটু ছাড়া কেউ নেই। সেকালে এখনকার মতো করিডর ট্রেন ছিল না। দরজা খুললেই প্ল্যাটফর্ম। আবার প্ল্যাটফর্ম থেকে এক পদক্ষেপে গাড়ির মধ্যিখানে।

জিনিসপত্র খাবার-দাবার নিয়ে দুজনে দিব্যি চলেছেন। মাঝখানে একটা স্টেশনে গাড়ি থামল ; একটু বাদেই আবার ছাড়ল। ছাড়ার পর যেই একটু বেগ বেড়েছে, অমনি দরজায় দুমদাম ধাক্কা। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, মায়ে-ঝিয়ে বই

boiRboi.net

পড়ছেন। ধাক্কার শব্দ শুনে বই রেখে দুজনে জানলা দিয়ে দেখেন একটা ঝাঁকড়া-চুল, লাল-চোখ, ষণ্ডামার্কা লোক পা-দানিতে দাঁড়িয়ে 'দরজা খুলুন! দরজা খুলুন!' বলে চ্যাঁচাচ্ছে।

পটোদিদির বড় দুঃখ হল। বুটুকে বললেন, 'খুলে দিই, কি বলিস্?' বুটু বলল, 'মোটেই না। পুরুষমানুষদের এত গাড়ি থাকতে ও মেয়েদের গাড়িতে উঠতে চাইবেই বা কেন? চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা চোর।'

পটোদিদি বিরক্ত হলেন, 'বাইরের চেহারা দিয়ে কাউকে বিচার করতে হয় না, বুটু। হয়তো ভুল করে এই গাড়িতে উঠেছে। কি কাতর ভাবে ডাকছে, শোন্ একবার।'

বুটু নির্দয়ভাবে বলল, 'সব ভাঁওতা। পাকা চোর। দরজা খুললেই গলা টিপে ধরবে।'

'কিন্তু যদি পড়ে যায়?'

'মোটেই পড়বে না। ঝুলে ঝুলে অভ্যাস হয়ে গেছে। হাতের মাস্‌ল্‌ দেখছ না?'

বলা বাহুল্য, এ সব কথাবার্তাই লোকটার কর্ণগোচর হচ্ছিল। সে-ও মওকা পেয়ে পটোদিদির উদ্দেশে নাঁকি সুর ধরল—'ও মাগো! আর তো পারিনে। এক্ষুনি পড়ব!'

আর থাকতে না পেরে পটোদিদি বললেন, 'দিচ্ছি খুলে!'

বুটু বলল, 'চেন্‌ টানব বলে রাখলাম। আমার মন গলানো অত সহজ নয়।'

কি আর করেন পটোদিদি। আবার বসে পড়ে লোকটাকে বলতে লাগলেন, 'সে-কথা সত্যি, বাছা। এদের বংশ যেমনি কঠিন-হৃদয়, তেমনি বদরাগী। দয়া-মায়া বলে এদের কিচ্ছু নেই। কিছু মনে কর না, বাছা, সাবধানে ঝুলে থাক। দেখো পড়েটড়ে যেও না।' এই বলে পটোদিদি আবার বই খুললেন।

একটু পরেই লোকটা আবার চ্যাঁচাতে লাগল, 'ও মা! বড্ড জল-তেষ্টা পেয়েছে! একটু জল দিন, মা!' পটোদিদি বললেন, 'সেটা দিতে বোধ হয় বাধা নেই।' তারপর রাগত ভাবে মেয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সঙ্গে ভীম নাগের সন্দেশ আছে, তার দুটো-একটা দেওয়া যেতে পারে কি?'

বুটু বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'যেতে পারে, যদি দরজা না খুলে দেওয়া যায়।' পটোদিদি জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে জল আর সন্দেশ দিলেন। লোকটা সেগুলো খেয়ে, সন্দেশের খুব প্রশংসাও করল। তারপর ঐ অবস্থায় ঝুলে ঝুলে পটোদিদির সঙ্গে গল্প করতে করতে, যেই দেখল দূরে স্টেশনের আলো, অমনি টুপ্‌ করে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পটোদিদি রাগত ভাবে মেয়েকে বললেন, 'চোর যদি হত, তাহলে জল নেবার সময় আমার সোনার বালাটা ছিনিয়ে নিল না কেন?' বুটু বলল, 'চোর না হলে চলন্ত গাড়ি থেকে টুপ্‌ করে নেমে পড়ল কেন?'

মালবিকার কাছে শোনা আরেকটা পারিবারিক গল্প বলি। বিখ্যাত গায়ক হেমেন্দ্রলাল রায় হলেন মালবিকার জ্যাঠামশাই। বিয়ে-থা করেননি। ভাগলপুরের গঙ্গার ধারে বুড়ি মায়ের সঙ্গে, তাঁদের পৈত্রিক বাড়িতে থাকতেন।

একতলার ঘর, পুরনো বাড়ি, জানলা সব লটখটে, শিকটিক নেই। শীতের রাত। এমন সময় কোনো উপায়ে জানলা খুলে ঘরে চোর ঢুকল।

খুট্‌খাট্‌ শুনে হেমেন্দ্রলাল জেগে উঠে মশারি থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়েই চোরকে দেখে মহা রেগে, মারবার জন্য তেড়ে গেলেন। কিন্তু তার নাগাল পাবার আগেই চোর অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হেমেন্দ্রলালের চক্ষুস্থির! ব্যাটা মরে-টরে গেল না তো?

এই কথা মনে হবামাত্র তিনি এমনি চেল্লাচেল্লি করতে লাগলেন যে পাশের ঘর থেকে বুড়ি মা তো বটেই, পাড়াসুদ্ধ লোক এসে হাজির হল। কেউ বলল, 'আহা! অমন ব্যবহার করতে আছে! ভয়ের চোটে ভিরমি গেছে!'

কেউ বলল, 'রাগ তো হবারি কথা! তাই বলে এত পেটাবেন যে অজ্ঞান হয়ে যাবে? হয়তো মরেই গেছে!'

বুড়ি মা বললেন, 'কতবার তোকে রাগতে মানা করেছি না? এখন হাতে হাতকড়া পড়ুক!'

হেমেন্দ্রলাল যতই বলেন চোরকে তিনি ছোঁননি, তা সে কথা কে শোনে! শেষটা ঐ কনকনে শীতের রাতে, বেশি করে টাকাকড়ি দিয়ে একটা ছ্যাকড়া-গাড়ি এনে, তাতে করে অচেতন চোরকে নিয়ে হেমেন্দ্রলাল হাসপাতালে গেলেন।

অত রাতে রুগী নিয়ে গিয়ে বেশ কিছু খরচ করে তবে চিকিৎসা মিলল। ওষুধ-পত্র পেটে পড়তেই চোরের জ্ঞান ফিরল। তখন হেমেন্দ্রলাল তাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছুঁইনি পর্যন্ত। তাহলে মুচ্ছো গেলে কেন?'

লোকটা বলল, 'আজ্ঞে, ক-দিন খেতে পাইনি, তাই। সেই জন্যেই চুরি করতেও গেছিলাম। পেটের দায়ে চোর হয়েছি।' বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। হেমেন্দ্রলাল ভয়েই মরেন, এই না আবার মুচ্ছো যায়।

শেষটা হাসপাতাল থেকেই তাকে দুধ, রুটি, ফল ইত্যাদি কিনে খাইয়ে সুস্থ করে, আবার সেই ঠিকে গাড়িতে তুলে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। চলে আসার আগে তার হাতে কুড়িটা টাকা দিয়ে বললেন, 'দেখ বাপু, অন্য জায়গার কথা বলছি না, কিন্তু আমার ওখানে না খেয়ে কখনো, চুরি করতে যাবে না। যদি মরেই যেতে, কি ফ্যাসাদে পড়তাম বল তো!'

চোর জিব কেটে বলল, 'না, না, বাবু, তাই কখনো পারি! আর গেলে পেট ভরে খেয়ে দেয়েই যাব!'

boiRboi.net

বাঘ ও বিজয়মেসো

ইলা পাল চৌধুরী ছিলেন রাজ্যসভার সদস্যা। তাঁর বাবা বিজয়চন্দ্র বসু ছিলেন আলিপুরের চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ। চিড়িয়াখানার বড় ফটক দিয়ে একটু দূরে এগোলেই বাঁ হাতে তাঁর সুন্দর কোয়ার্টার চোখে পড়ত। শৈশবে আমি সেই বাড়িতে কত সকাল বিকেল বড় আনন্দে কাটিয়েছি।

বিজয় বসুর শ্যালা ছিলেন আমার বড় মেসোমশাই। তবে শুধু সেই সুবাদেই ওঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা নয়। সেকালের ব্রাহ্ম পরিবারগুলোকে তাদের হিন্দু আত্মীয়-স্বজনরা খানিকটা অপ্রীতির চোখে দেখতেন বলে, ব্রাহ্মদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা ছিল বেশি। বিজয় বসুর স্ত্রীকে আমরা ইন্দুমাসিমা বলতাম। আমার জ্যাঠামশাই উপেন্দ্র-কিশোরের বাড়িতে আমার জন্মের আগে থেকেই তাঁদের যাওয়া-আসা ছিল। যতদূর জানি ইন্দুমাসিমা বিয়ের আগে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে পড়াতেন। আমার মা তখন ওখানকার ছাত্রী ছিলেন।

সে যাই হোক, আমাদের কাছে বড়-মাসিতে আর ইন্দু-মাসিতে বিশেষ তফাৎ ছিল না। বরং আমাদের কাছে ইন্দুমাসির বাড়িটাই বেশি আকর্ষণীয় ছিল। ঘাস-জমির পাশে, ফুল-বাগানের কিনারায় আঁকাবাঁকা পুকুর, তাতে কালো রাজহাঁস চরত। এক-বার দেখেছিলাম জলের মধ্যে ঘন সবুজ ঘাসের চাপড়া ; তার মধ্যিখানে কালো রাজ-হাঁস ডিম পেড়ে, ন্যাড়া ন্যাড়া বাচ্চা পালছে।

অনেক সময় চিড়িয়াখানায় জন্মানো ছোট ছোট জানোয়ারদের আর রুগ্ন পাখিদের, কিছুদিন নিজের বাড়িতে রেখে, বিজয়মেসো তাদের দেখাশুনো করে সুস্থ করে তুলতেন। একবার একটা সুন্দর ঝাঁকড়াচুল বদমেজাজি কুকুর আমাকে কামড়ে দিয়ে-ছিল। আরেকবার এক জোড়া নীল লোম-ওয়ালা পার্শিয়ান বেড়ালের গায়ে হাত বোলাতে গেলে, তারা আমার ছোট ভাইয়ের হাতে চার ইঞ্চি লম্বা আঁচড় দিয়েছিল। সেখানে আইডিন দিতে হয়েছিল। বিজয়মেসো বলেছিলেন অচেনা লোক দেখলে রুগ্ন জানোয়াররা ভয় পায়।

বিজয়মেসোর বাড়ির কাছেই বাঘের ঘর। সেখান থেকে নানা রকম অদ্ভুত আওয়াজ আসত।

কিন্তু বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ছিলেন বিজয়মেসো নিজে। মাঝারি লম্বা, শক্ত কর্মঠ চেহারা, চোখ দেখে মনে হত সর্বদা হাসি পাচ্ছে। বাড়িসুদ্ধ সবাই গান-বাজনা-পাগল, বাদে উনি। তবে স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে মাঝে মাঝে তাঁকেও গুন গুন করতে শোনা যেত, 'সা-গা! গা-ধা! গা-ধার পা! না মানুষের পা!'

boiRboi.net

কৈশোরে যত জায়গায় গিয়েছি, বিজয়-মেসোর বাড়ির কাছে কোনোটা দাঁড়াতে পারত না। এমন কি তাঁদের শোবার ঘরে গিয়ে দেখেছি বিশাল এক মশারির নিচে মস্ত এক বিজুলি পাখা ঘুরছে!

ইন্দুমাসির বাড়ির হল্‌ঘরের দেয়ালে একটা বড় হুকে সর্বদা একটা গুলি-ভরা বন্দুক ঝুলত। চারদিকে নানা রকম হিংস্র জানোয়ারের বাস। হঠাৎ কি বিপদ ঘটে বলা তো যায় না। তবে কেউ নাকি কখনো ঐ বন্দুকটাকে ব্যবহার হতে দেখেনি।

একদিন রাতের খাওয়া সেরে বিজয়মেসো সবে উঠেছেন, এমন সময় একজন

চৌকিদার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলল, 'সাহাব! শের ভাগা!' বিজয়-মেসো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি রে! কোন শের ভাগা?' সে বলল যে নতুন বাঘটা বোষ্টন সাহেব উপহার পাঠিয়েছেন, সেই বাঘ কাঠের ক্রেট্‌ ভেঙে পালিয়েছে।

বিজয়-মেসো বললেন, 'তাঁর খাঁচা তো তৈরি ছিল। সেখানে পোরা হয়নি কেন?' চৌকিদার বলল, 'নাথুলালের জ্বর হয়েছে, সে কাজে আসেনি। বাকিরা অত বড় বাঘ ঘাঁটতে ভয় পাচ্ছে।'

বিজয়-মেসো আঁচিয়ে এসে, দেয়াল থেকে বন্দুকটা পেড়ে নিয়ে বললেন, 'চল্‌ তাহলে।' চৌকিদারের মুখ শাদা, 'সাহাব!' বিজয়-মেসো বললেন, 'কেন, তোর কাছে খাঁচার চাবি নেই?' 'জি, হাঁ।' 'তবে আবার কি? আমার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌!' একটু তফাৎ রেখে চৌকিদার পেছন পেছন চলল।

BanglaBook.org

গেট দিয়ে বেরোতেই, সামনের অন্ধকার ঝোপঝাপগুলো একটু নড়ে উঠল আর একটা বিরাট বাঘ বেরিয়ে এসে, বিজয়-মোসোর দুই কাঁধে দুই থাবা রেখে, দু-পায়ে উঠে দাঁড়াল। ওঁর গলার কাছে বাঘের মুখ।

বিজয়মেসো প্রমাদ গণলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন বাঘের গলা থেকে খুশি-হওয়া বেড়াল-ছানার মতো খ-র-র খ-র-র শব্দ বেরোচ্ছে!

আর বলে দিতে হল না। এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে, নরম গলায় বিজয়মেসো বললেন, 'আরে বাচ্চু! বাচ্চু! তুই ফিরে এসেছিস্!'

বাঘটাও কি করবে ভেবে না পেয়ে ওঁর বুকে মাথা ঘষতে লাগল। বিজয়মেসো পকেট থেকে ওঁর বড় রুমালটা বের করে নিচু হতেই বাঘও চার পা মাটিতে নামিয়ে ওঁর পায়ে মুখ ঘষতে লাগল। বিজয়-মেসো ওর গলায় রুমাল বেঁধে, চৌকিদারকে বললেন, 'তুই আগে আগে গিয়ে দু-নম্বর খাঁচার দরজা খোল। ওটাই তৈরি আছে।'

চৌকিদার এতক্ষণ হাঁ করে ভাবছিল এ কি ভেল্কি দেখছে, না কি? এখন সে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। চাবি নিয়ে দৌড়ল। বিজয়মেসোও বাঘের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাঁচার মধ্যে ঢুকলেন। তারপর বাঘের মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুই এখন ঘুমো বাচ্চু। আমি কাল আবার আসব।'

বেরিয়ে এসে খাঁচার তালায় চাবি ঘুরিয়ে, চৌকিদারকে বললেন, 'চল্ রে, রাম-ধরিয়া। অনেক রাত হল।'

রামধরিয়ার মুখে কথা নেই। কিছু দূর গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বিজয়-মেসো বললেন, 'কি রে, তাজ্জব বনে গেছিস্ বুঝি? আরে মানুষ ভুলে যায়, জানোয়ার কখনো ভোলে না। ঐ বাচ্চু এই বাগানেই জন্মেছিল। ওর মা তখনি মারা গেছিল। আমি ঝুড়িতে করে ওকে বাড়ি এনে, বোতলে করে দুধ খাইয়ে বড় করেছিলাম। এই বাড়িতে ওর শৈশব কেটেছিল। তাই ছাড়া পেয়েই এখানে চলে এসেছিল।

জানিস্ তো এখানকার নিয়ম, বাড়তি জানোয়ার ভালো জায়গা দেখে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এক সাহেব ওকে কিনেছিল মনে আছে। সে বোধ হয় বিলেত ফিরে যাবার সময় বোল্টনকে বাঘটা দিয়ে গেছিল। বোল্টনকে আমি চিনি না, তাই হঠাৎ বুঝতে পারিনি।

বাচ্চু কিন্তু আমাদের বাড়ি আর আমাকে ঠিকই চিনেছিল।

boiRboi.net

রসের গল্প

পৃথিবীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা—তা সে প্রেমের ব্যাপারই বলুন, কি চুরি-ডাকাতিই বলুন—চাঁদের আবছা আলোয় ঘটতে পারে, কিন্তু রসের ব্যাপারের বেশির ভাগই যে দিনের আলোয় প্রত্যক্ষভাবে পথে ঘাটে ঘটে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। বিশেষ করে ট্রামে, বাসে, রেলগাড়িতে। সেখানে এতটুকু রসের ব্যাপার ঘটলে দশজন উপভোগ করে বলে দশগুণ জমে।

একবার আমার মণিদা (সত্যজিতের কাকা সুবিনয়) রাতের ট্রেনে জব্বলপুর যাচ্ছেন। বৌদি তাঁর সঙ্গে টিপিনকারি ভরতি ভালোমন্দ খাবার দিয়েছেন, যেমন তাঁর অভ্যেস ট্রেন ছাড়লে, পায়ের কাছে মেঝের ওপর টিপিনকারিটি রেখে, নিচের বার্থে পা মেলে শুয়ে, মণিদা একটা রহস্যের বই পড়ছেন আর একটু পরে ক্যায়সা ভোজ হবে ভাবছেন।

মাথার ওপরের বার্থে আরেক ভদ্রলোকও নিচে টিপিন-কারি রেখে, খচমচ করে ওপরে উঠে শুয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বই-টই ছিল না, কিম্বা পড়ার শখ ছিল না। সে যাই হোক, কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ভদ্রলোক বললেন, 'নাঃ, কাঁহাতক শুয়ে থাকা যায়, খেয়েই নিই।'

এই বলে ওপর থেকে নেমে এসে, মণিদার পায়ের কাছে একটু জায়গা ছিল, সেখানে বসে, টিপিনকারি খুলেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, 'এ্যাঁ! ই কি! গিন্নির যে হাত খুলেছে! লুচি! চপ! কিমার ডালনা! ছানার জিলিপি! ওয়া! ওয়া! একেই বলে কপাল-খোলা!' এই সব বলছেন আর গপাগপ্ গিলছেন।

রহস্যের উপন্যাসের গভীর সমুদ্রের তলা থেকেও কথাগুলো মণিদার কানে গেল। কানে যেতেই কেমন খট্‌কা লাগল। মণিদা উঠে পড়ে বললেন, 'ও কি মশাই! আপনি যে আমার টিপিন-কারি খুলে আমার খাচ্ছেন! এর মানে কি!'

ভদ্রলোক বললেন, 'এ্যাঁ! তাই নাকি! এই রে! রাতে চোখে ভালো দেখি না কিনা, তাই দুটোকে অবিকল একই রকম দেখতে লাগছিল। দেখুন তো কাণ্ড, মশাই। অবিশ্যি সে রকম ক্ষতি হয়নি, মশাই। আপনি আমারটা খেয়ে ফেলুন। ফেয়ার এক্সচেঞ্জ!'

তারপর মণিদা যখন সেই ভদ্রলোকের টিপিন-কারি খুলে গোটা ছয় হাতের রুটি, বেগুন পোড়া, মুলোর ঘণ্ট, দুটো চাঁপা-কলা বের করলেন তখন ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, 'দেখলেন তো মশাই! সাধে বলে স্বভাব যায় না মলেও!'

তাই শুনে গাড়িসুদ্ধ সবাই এমনি ভীষণ হাসতে লাগল যে মণিদা পর্যন্ত না

হেসে পারলেন না।

আরেকবার আমার ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন রায় বাসে করে যাচ্ছেন। একটুও জায়গা নেই, ছাদের রড্ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় এক মাতাল উঠে, হাসি-হাসি মুখ করে ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হিক্কা তুলতে লাগল।

চারদিকে একটা মৃদু মোদো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। তখন গাড়িসুদ্ধ যাত্রীরা কন্-ব্লাক্টরকে বলতে লাগল, 'হয় ওকে নামিয়ে দাও, নয়তো আমরা সবাই নেমে যাব।'

এ-কথা শুনে মাতাল মুচ্‌কি হেসে বলল, 'কেন ওয়া-ওয়া? আমি তো কিচ্ছু কিচ্ছিটিচ্ছি না। নামাবে কেন?' তাতে যাত্রীরা আরো গরম হয়ে ওঠাতে, শেষ পর্যন্ত কন্ডাক্টর তাকে বলল, 'না, মশাই, আপনি বরং নেমেই যান।'

সে বলল, 'যাচ্ছি, বাপু, যাচ্ছি। আগে আমার পহা ফেরত দাও, তাপ্পর আমি নামব।' কন্ডাক্টর চটে গেল, 'কি বাজে বকছেন! আপনি পয়সা-টয়সা দেননি।'

সে তবু বলল, 'দিইচি, বাবু, নিশ্চয় দিইচি। আমি পহা দিইচি তা আমি জানব না, তুমি জানবে?'

কণ্ডাক্টর বেকুব বনে বলল, 'আমাকে পয়সা দিয়েছেন বলছেন?' সে জিব কেটে বলল, 'ছি ছি তা বলব কেন? তোমাকে দেবই বা কেন? তুমি তো ঢের পাচ্চ। আমি ঐ ব্যাটাকে দিইচি।' এই বলে জ্যাঠামশাইকে দেখিয়ে দিল।

তিনি তো চটে কাঁই! 'ফের মিছে কথা! তুমি কখন আমার হাতে পয়সা দিলে?' সে মাথা দুলিয়ে বলল, 'হাতে দোব কেন? ভদ্দরলোকের হাতে পহা দিতে হয়? পকেটে দিইচি।' জ্যাঠামশাই রেগেমেগে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নিজের বুক-পকেটের দিকে চোখ পড়ল। দেখেন ভাঁজ করা রুমালের ওপর পাঁচটা তামার পয়সা রয়েছে!

তখন বাস্-সুদ্ধু লোক কি হাসিটাই হেসেছিল সহজেই অনুমান করা যায়। ততক্ষণে হাসতে হাসতে মাতাল-ও তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, টুপ করে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। জ্যাঠামশাইও হাসিমুখে পয়সাগুলো কণ্ডাক্টরকে দিয়ে, তাঁর স্টপে নামলেন।

আমাদের বন্ধু, রামধনুর সম্পাদক অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য একটা ভালো গল্প বলেছিলেন। তাঁর দুই আত্মীয়া বাসে করে যাচ্ছেন। বেজায় ভিড়। বসবার জায়গা তো নেই-ই, মধ্যিখানের প্যাসেজটাও মানুষে ঠাসা। সবাই কোনো-মতে আঁকড়ে-পাকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকের সীটে আত্মীয়ারা দু-জন, ওদিকের সীটে জানলার কাছে এক ভদ্রলোক, তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রী।

এমন সময় বাসের যেমন অভ্যাস, দারুণ এক ঝাঁকি দিয়ে সে বেগ বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ানো ভদ্রলোকদের একজনের হাত ফস্কে গিয়ে, তিনি ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রীর কোলে ঝুপ করে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে প্রভূত ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের রাগ দেখে কে! 'মশাই, আপনি কোন অধিকারে আমার স্ত্রীর কোলে বসলেন?'

বেচারি যতই বলেন, 'পড়ে গেছি ভাই, ইচ্ছে করে কখনো বসতে পারি?' ভদ্রলোক ততই গরম হন, 'বাজে কথা রাখুন! চালাকি করবার জায়গা পান নি, না?' বাস্-সুদ্ধ সবাই বোঝাতে চেষ্টা করল যে ব্যাপারটা নিতান্ত আকস্মিক, একেবারেই ইচ্ছাকৃত নয়, তা কে কার কথা শোনে!

শেষ পর্যন্ত অপরাধী ভদ্রলোক তাঁর মনিব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে, রাগী ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললেন, 'ধরুন, এতে আমার নাম, পেশা, ঠিকানা, সব দেওয়া আছে। আপনি যখন খুশি আমার বাড়িতে গিয়ে, যতক্ষণ ইচ্ছা আমার স্ত্রীর কোলে বসে থাকতে পারেন। আমরা কেউ কিচ্ছু মনে করব না।'

এ-কথা শুনে বাসের লোকরা কি করল সেটা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না।

boiRboi.net

রেলগাড়িতে

এর আগেও বলেছি ট্রেনে অচেনা লোকদের সঙ্গে যেমন গল্প জমে, তেমন আর কোথাও নয়। বিশেষ করে যদি তাদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এ-সব লোকদের কি না বলা যায়। মনের সব গোপন কথা নিশ্চিন্তে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়। তবে আমাদের মতো যাদের দৌড় হাওড়া থেকে বোলপুর স্টেশন, তাদের পক্ষে সে-রকম কাঠ অচেনা পাবার সম্ভাবনা কম। তবু তাই বা মন্দ কি।

গত বছর একটা কামরায় উঠলাম, তার দরজা বন্ধ হয় না। বন্ধ হবার হাত-ছিট্‌কিনি কিচ্ছু নেই। হাতে হাতে জিনিসপত্র নিয়ে তার পাশের গাড়িতে চড়লাম। তার দরজাটা আবার এমনি এঁটে গেল যে খোলাই যায় না। তাছাড়া আলো জ্বলে না, পাখা বন্ধ হয় না।

বলিষ্ঠ প্যাটার্নের অল্প-বয়সী এক যাত্রী সস্ত্রীক এসে ভদ্রভাবে হাঁকডাক করতে লাগলেন, 'দয়া করে ছিট্‌কিনিটা খুলে দিন।' বলা হল, 'ছিট্‌কিনি খোলা আছে, জোরে ধাক্কা দিন।' অগত্যা অনেক পরিশ্রম করে দরজা খোলা হল, আলগোছে বন্ধ করা হল, হাতল ঘোরানো হল না। তবু একটা সন্দেহজনক ক্লট্‌ শব্দ হল।

আগন্তুক দু-জন বাংলাদেশ থেকে ১৫ দিনের ভিজা নিয়ে, এই প্রথম ভারত দেখতে এসেছেন। দিল্লী রাজস্থান শফর করে, আপাততঃ শান্তিনিকেতনে যাচ্ছেন।

আরেকবার ধাক্কাধাক্কি করে দরজা খুলে একজন আধা-বয়সী ভদ্রলোক ঢুকলেন। তিনি বিশ্বভারতীর বিশিষ্ট অধ্যাপক। একজন চালাক-চতুর চেহারার পদাধিকারীও উঠলেন। মনে হল রেলের এঞ্জিনীয়ার গোছের কেউ। আমাদের অভিযোগ শুনে বার দশেক দরজাটাকে খুলে বন্ধ করে, প্রমাণ করে দিলেন উটি আটকে যাওয়া অসম্ভব! ইনিও কার্যব্যপদেশে এই লাইনে হামেশাই যাওয়া-আসা করেন। বলা বাহুল্য, দরজা আর আটকাল না। কুকুর মুগুর চেনে।

৮-১০ বছরের মেয়ে নিয়ে একজন যুবক উঠলেন। তাঁর মামার বাড়ি শান্তি-নিকেতনে। কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র-গোছের ছোকরা উঠল। তারা গুস্‌করায় নামবে। এ অঞ্চল তাদের নখ-দর্পণে। দেখতে দেখতে গল্প জমে উঠল।

লুপ-লাইনে সর্বদা পুরনো প্রায়-অচল গাড়ি দেয়। লুপ-লাইনে ঢুকেই গাড়ি আঘাটায় দাঁড়িয়ে গেল। পদাধিকারী বিরক্ত হয়ে নেমে গেলেন। বলে গেলেন, 'এ ইঞ্জিন আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। এর বজ্জাতির শেষ নেই। এবার আমি অবসর নিচ্ছি, তাপ্পর একে কে ঠেকাবে দেখব!'

শেষটা তাঁর নির্দেশে লাইনের পাশে পড়ে থাকা কাঠের তক্তা এঞ্জিনের কোনো

বিশেষ জায়গায় গুঁজে দেওয়াতে সে আবার চলতে শুরু করল।

ছোট ছোট কামরা। দরজা খুললেই প্ল্যাটফর্ম। চারজনের জায়গায় দশজন যাত্রীকে ঠেসেঠুসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে হল। দুজন তো অতি বিপজ্জনক ভাবে চায়ের পেয়ালা রাখার নড়বড়ে শেল্‌ফ আঁকড়ে-পাকড়ে রইল। গল্প জমার এমন ভালো পরিবেশ আর কোথায় পাওয়া যাবে?

বাংলাদেশের ছেলে-বৌকে বিদেশী বললে হাস্যকর ব্যাপার হয়। হাল-চাল, কাপড়-চোপড়, কথা-বার্তা আমাদের ঘরের মতো। খালি 'আজ্ঞে' না বলে, বলল 'জি', এই যা তফাৎ। অধ্যাপকমশাই একজন নামকরা নৃতত্ত্ববিৎ, দেশে-বিদেশে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। এঁদের কথায় বোঝা গেল দেশ-বিদেশ বলে আলাদা দুটো জিনিস নেই। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল, কামরায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কারো পৈতৃক বাড়ি ঢাকায়, মামা-বাড়ি চাটগাঁয়ে; কারো বাড়ি চাটগাঁয়ে, মামাবাড়ি সিলেটে; কারো শ্বশুরবাড়ি কুমিল্লায়, থাকেন ঢাকায়; আমার বাপের বাড়ি ময়মনসিংহে, শ্বশুর-বাড়ি কুষ্ঠিয়ায়, বাস করি পশ্চিম-বাংলায় আর হোমটাউন লিখি কলকাতা, যেখানে আমি জন্মেছি।

অধ্যাপক ভারতের পূর্ব সীমান্তে অনেক দিন ধরে নানা তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকের ধারণা যেখানে পশ্চিম-বাংলা শেষ হয়ে বাংলাদেশ শুরু

boiRboi.net

হয়েছে, সে-জায়গায় অস্ত্রধারী সৈন্য-সামন্ত বিজবিজ করছে ; কামান, কাঁটাতারের বেড়া, রক্ষীবাহিনী, পারমিট, বিপদ। আজ শুনলাম কয়েকটা বিশেষ জায়গায় ঐ ধরনের পরিস্থিতি হলেও, আসলে কোথায় যে একটা দেশ শেষ হয়ে অন্যটা শুরু হল, তা টেরও পাওয়া যায় না।

প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাড়ি-ঘর, হাল-চাল, কথা-বার্তা, সব এক রকম। তারা যে কোন দেশের নাগরিক সেটা নিজেদের মনে থাকে কি না সন্দেহ। কার্যব্যপদেশে অধ্যাপক-মশাইকে ঐ রকম এলাকায় যেতে হয়েছিল। মুশকিল হল, তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে, অথচ কোন দেশে যে আছেন তাই বোঝা যাচ্ছে না।

তারি মধ্যে শুনলেন যে সম্প্রতি ভাগাভাগি কি ঐ রকম কিছু নিয়ে একটা পরিবারের মধ্যে মহা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, 'ডাক্ মামুকে! মামু এসে ঠিক করে দিয়ে যাক।' মামু কোথায়? না, ওপারে। এঁরা জানতে চাইলেন নদী-টদী আছে নাকি যে ওপারে?

গ্রামবাসীরা হাসতে লাগল, না কত্তা, অদ্দুর যেতে হবে না। এই তো এইখানে, সীমান্তটুকুর ওপারে।' অধ্যাপক অবাক হলেন। 'এপারের জমি নিয়ে বিবাদ, তা ওপারের লোক এসে মীমাংসা করে দেবে মানে?'

গ্রামবাসীরা অবাক হল, 'তা দেবে না? পাঁচ পুরুষ ধরে এদের পরিবারের সব সমস্যা ওরা মিটিয়ে দিচ্ছে। এখন আবার কি এমন হল যে দেবে না?'

এই তো সীমান্তের ব্যাপার।

অধ্যাপককে আরেকজন বললেন, 'সেখানে ঘেঁষাঘেঁষি কাছাকাছি বাড়ি-ঘর। তারি মধ্যিখান দিয়ে সীমান্ত রেখা টেনে দিয়েছে। চাচা তো চটে লাল, "ই কি! ভায়ের বাড়ি পড়ল ওদেশে, আমারটা এদেশে। ওদের বাড়ি থেকে মরিচ চেয়ে আনতে কি পারমিট নিতে হবে?'

শেখ বললেন, 'বৌয়ের বাপের বাড়ি ওদিকে পড়েছে। তোমার ভায়ের বাড়ির পাশেই। আমাদের বাড়ি এদিকে। কে'দেকেটে বৌয়ের চক্ষু লাল! তার চেয়ে তোমার ভাইকে বল পোঁটলা-পাটলি নিয়ে অখনি চলে আসুক আমাদের বাড়ি। আমরাও ওদের বাড়ি যাই।' ব্যস্, মিটে গেল।

এক কোঁকড়া-চুল যুবক বললে, 'শুধু দেশ কেন, ভাষার কথাই ধরুন না। কোনটা দেশী, কোনটা বিদেশী কথা তার কিছু ঠিক আছে? বারাসতের দিকে পথের ধারে, চায়ের দোকানে চা খাব। জিগ্‌গেস করলাম, 'ভাঁড় ছাড়া পেয়ালা-পিরিচ নেই?' তা এক মাস্তান বসে ছিলেন, তিনি দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, 'অত ইংরিজি বিদ্যে জাহির করতে হবে না মশাই। প্যায়লা-পিরিচ! কেন, সোজা বাংলায় কাপ্-ডিশ্ বলতে বুঝি অপমান লাগে?'

অধ্যাপকেরও ঐ রকম অভিজ্ঞতা। পশ্চিমের কোনো শহরে রিক্‌শায় উঠে বললেন, 'সচিবালয়।' রিক্‌শাওয়ালা রেগে উঠল, 'ইংরিজি বাৎ ছোড় দিজিয়ে। ও-সব

boiRboi.net

দিন চুকে গেছে। যেতে চান তো সিধা হিন্দী বলুন।'

অধ্যাপক বুদ্ধি করে বললেন, 'সেক্রেটারিয়াট।' রিক-শাওয়ালা খুশি হয়ে তাঁকে সচিবালয়ে নিয়ে গেল।

বোলপুর স্টেশনে যখন সবাই মিলে নামলাম, তখন কার দেশ কোথায়, তাই নিয়ে সকলেরি একটু গোলমাল লাগছিল। আমার মামা-বাড়ি আবার ফরিদপুরে ; সেখানে বাংলাদেশের ছেলেটির মামা-বাড়ি।

কালো সায়েব

আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছি ঠাকুরদা যখন ছোট ছিলেন, তখন আমাদের দেশে বাঘ-বাঘেল্লা গিজ্-গিজ্ করত। বাঘ বলতে চক্‌রা-বক্‌রা চিতে নয়। তাকে ওদেশের লোকে বাঘ বলেই স্বীকার করত না। বলত নাকি বিল্লি, বড় জোর মেকুর। বাঘের গায়ে হলুদ-কালো 'ডুরা' কাটা থাকে।

বাবারা যখন ছোট ছিলেন তখন আর বিশেষ বাঘটাগ দেখা যেত না। খালি এক-বার দেখেছিলেন, সে গল্প আগেও বলেছি। এবার বিস্তারিত শুনুন। বড় জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন কলকাতায় অধ্যাপনা করেন, ছুটিছাটায় দেশে যান। ছোট পিসিমা বাবা আর ছোট জ্যাঠা মসুয়াগ্রামে ঠাকুমার কাছে থাকেন। বাবাকে সামলাবার জন্য একজন ষণ্ডা মতো চাকর-ও থাকে।

পুজোর আগে বাবারা অস্থির, 'ঠাকুরদা কবে আইব?' ঠাকুরদা মানে বড়দা, আসল ঠাকুরদা নয়, আশা করি সেটা বলে দিতে হবে না। ওখানকার ডাকগুলি বড় মিষ্টি ছিল। বড়দা মেজদা সেজদা ন-দা ছোড়দা নয়। ঠাকুরদা, সোনাদা, সুন্দরদা, ধনদা, ফুলদা ইত্যাদি। তবে ছোটপিসিমা বাবাকে ফুলদা না বলে শম্ভুয়া বলেই ডাকতেন শুনেছি।

সে যাই হোক, শেষটা একদিন ঠাকুরদা আর সুন্দরদা তো আইলেন। সঙ্গে নতুন কাপড়, জামা, জুতো, মিষ্টি, হকি-স্টিক্, নতুন ফুটবল ইত্যাদি। কিন্তু 'ঠাকুরদা'র বড্ড বেশি কড়া শাসন। নতুন জিনিসগুলো পুরনো হবার আগেই ছোট ভাইরা বুলি ধরল, 'মা, ঠাকুরদা কবে যাইব?'

সুখের বিষয়, এই সময় ঠাকুরদা ওঁদের মাছ ধরতে, কাছিম মারতে আর শেয়াল

pathagar.net

শিকার করতে নিয়ে যেতে লাগলেন। ফাঁদ পেতে শেয়াল আর খরগোশ ধরা হত। গ্রামের লোকরা মহা খুশি। শেয়ালে বাঙি খেয়ে যায়। বাঙি হল গিয়ে ফুটি। খরগোশে শাক-সবজি নষ্ট করে। একদিন সকালে কেউ উঠবার আগে, ফাঁদ দেখতে গিয়ে বাবা আর ছোট জ্যাঠা দেখেন, ফাঁদের সমস্তটা জায়গা জুড়ে, খরগোশের বদলে গোঁফ ফুলিয়ে বাঘ এশাই বসে আছেন। এর আগে এত কাছে থেকে 'ডুরা' কাটা বাঘ বাবারা কখনো দেখেননি। কথাটা ঠাকুমার কানে যেতেই ফাঁদ পাতা বন্ধ হল।

আমাদের ছোট বেলায় গল্প শোনা মানেই ছিল রামায়ণ মহাভারতের গল্প, মসুয়ার নানা গল্প, কিম্বা জরিপের কাজে বাবার বনে বনে ঘোরার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। মাঝে মাঝে অন্যরাও চমৎকার গল্প বলতেন। মেজ-জ্যাঠার জামাই অরুণ চক্রবর্তী আগে ছোটনাগপুরের বন্য অঞ্চলের কাছাকাছি নানা জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ছিলেন। জামাইবাবুর বন্ধুবান্ধবরা বেজায় গপ্পে ছিলেন। জামাইবাবু আবার সে-সব গল্প আমাদের বলতেন। তার একটা বলি।

ওঁদের এক সায়েব-প্যাটার্ণের সহকর্মী ছিলেন। তাঁকে সবাই কালা-সায়েব বলত। ট্যুরে বেরোলেই তিনি এমন সব জায়গা বেছে রাত কাটাবার চেষ্টা করতেন, যেখানকার বাবুর্চির ভালো রাঁধিয়ে বলে সুনাম। সরকারী ডাক-বাংলোয় সাধারণতঃ এ-রকম লোক মজুত থাকত। তাই আত্মীয়স্বজন কি বন্ধুবান্ধব থাকলেও, তাদের এড়িয়ে উনি ডাক-বাংলোতেই উঠতেন।

সেকালে মোটর গাড়ির এত চল ছিল না। সায়েব-সুবোরা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। চমৎকার সব ঘোড়াও দেখা যেত। বলা বাহুল্য কালা-সায়েবেরো ঘোড়া ছিল। একবার ঐ রকম ট্যুরে বেরিয়ে, সেদিনের কাজ সেরে দেখলেন সূর্য পাটে নেমেছেন।

ছোট শহর ; পাশে বন ; তার উপকণ্ঠে সুন্দর ডাক-বাংলো। পেছনে আম-বাগান। চৌকিদার বাবুর্চি থাকার কথা। অথচ হাঁকডাক করে কারো সাড়া পাওয়া গেল না। একটা ন্যাংটো ছোকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। তাকে তাড়া দিতেই সে ছুটে গিয়ে চৌকিদার বাবুর্চিকে ডেকে আনল। আম-বাগানের পেছনে তাদের কোয়ার্টার।

তারা এসেই সায়েবকে ভাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। পুরনো ডাক-বাংলো, নড়-বড়ে দরজা-জানলা, ধারে-কাছে জনমানুষ নেই, জায়গা খারাপ, কেউ এখানে রাত কাটায় না ইত্যাদি। মাত্র দু-মাইল এগিয়ে গেলেই ছেত্রীর হোটেলে চমৎকার ব্যবস্থা পাবেন। দোতলা বাড়ি, বামুন-ঠাকুর, লোকজনের আলাদা ঘর, আস্তাবল। সায়েব বললেন, 'আমার ঘোড়া আর লোকজন হয় গ্রামে থাকবে, নয় তোমাদের কোয়ার্টারে। আমি সরকারের কর্মচারি, এখানেই থাকব। ভালো চাও তো ঘরদোর খোল। চিমনি জ্বালো, বড্ড শীত। রাতে ঘি-ভাত আর মুরগির কারি বানাও। বেশি কথা বল না। আমি ভূতটুতে বিশ্বাস করি না। আগে গরম জল লে আও।'

কড়া মেজাজ দেখে সবাই চটপট কাজে লাগল। সব ব্যবস্থা হল। লোকজন ঘোড়া-

সহ চলে গেল। বসবার ঘরের চিমনিতে কাঠের আগুন জ্বলল। স্নানের ঘরে গরম জল পৌঁছল। রান্না চড়ল। তার আগে চা বিস্কুট হল।

রান্নাও দেখতে দেখতে হয়ে গেল। মনে হল চৌকিদার, বাবুর্চি কাজ সেরে চলে যেতে পারলেই বাঁচে। সবই ভালো, খালি ঘরে কেমন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। হয়তো এরা সবাইকে ভাগায়। ঘরদোর খোলেই না।

সাড়ে সাতটায় চমৎকার ডিনার খাওয়াল বাবুর্চি। আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ। সঙ্গে সঙ্গে ধোয়া-পাকলা, দরজা-জানলা বন্ধ, ছিটকিনি দেওয়া, সব সারা।

লণ্ঠন হাতে চৌকিদার বাবুর্চি এসে বলল, 'সায়েব তাহলে শুয়ে পড়ুন। আমরা রান্নাঘরের দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাচ্ছি। সকালে সাড়ে ছটায় চা দেব।' সায়েব বললেন, তোমরা যাও। আমি চিমনির ধারে বসে কিছু রিপোর্ট লিখব।

boiRboi.net

পড়ে শোব।'

ওরা এ-ওর দিকে চেয়ে বলল, 'সত্যি বলছি, এ-ঘর ভালো নয়। আপনি শোবার-ঘরে গিয়ে কাজ করুন। আমাদের কথা শুনুন। ও-ঘরেও আংটায় আগুন দিয়েছি।' কিন্তু সায়েব কোনো কথাই শুনলেন না। ওদের ভাগিয়ে দিয়ে, চিমনির পাশে কৌচে শুয়ে কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। পেট ভরে খেয়ে, আরামে গরমে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন, নিজেই টের পেলেন না।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেন, তেল ফুরিয়ে লম্প নিবে গেছে। চিমনির কাঠ পুড়ে কয়লা। তারি সামান্য আলোতে দেখা যাচ্ছে চিমনির সামনে গালচের ওপর হলুদ-কালো ডোরা কাটা একটা গালচে না কি যেন পড়ে আছে। ঘরের সেই সোঁদা গন্ধটা বেজায় বেড়ে গেছে। আধা অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতেই সায়েব আঁৎকে উঠলেন। চিমনির সামনে ও যে মস্ত বাঘ! থাবার ওপর মুখ রেখে ঘুমোচ্ছে!

মিছিমিছি পনেরো বছর হাকিমি করেননি সায়েব। সঙ্গে সঙ্গে কৌচের অন্য দিক দিয়ে নেমে, চটি টটি ফেলে রেখে, এক দৌড়ে ও-ধারে শোবার ঘরে ঢুকে, দরজায় খিল দিতে তাঁর এক মিনিটও লাগল না। বুকটা ঢিপঢিপ করছিল। ও কি সত্যি বাঘ, না আর কিছু?

আশ্চর্যের বিষয়, দাঁত কপাটি থামলে ঘুমিয়েও পড়লেন। সকালে খাবার ঘরে পেয়ালা পিরিচের টুংটাং শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ধুমায়িত চা এল। চানের ঘরে গরম জল এল। চান করে তৈরি হয়ে, চমৎকার ব্রেক্‌ফাস্ট-ও পেলেন। লোকজনরা ঘোড়া নিয়ে এসে গেল।

চৌকিদার বাবুর্চির পাওনা চুকিয়ে, চলে যাবার আগে সায়েব বললেন, 'কাল রাতে এ-ঘরে কে এসেছিল? এ কার চুল?' এই বলে মাটি থেকে এক গুছি হলুদ-কালো, লম্বা লোম তুলে দেখালেন। অমনি তারা দুজনে ওঁর পায়ে পড়ল।

'সায়েব, ওর কথা রিপোর্ট করলে, হেডকোয়ার্টার থেকে শিকারী এসে ওকে গুলি করে মেরে ফেলবে। কাউকে কিছু বলে না ও। গরম কালে ওর দেখাও পাওয়া যায় না। এখন বুড়ো হয়েছে, দাঁতগুলো গেছে, শীতের রাতে বনে ওর বড় কষ্ট হয়। তাই বাসন-ধোয়ার ঘরের জানলা খুলে রাখি। রাতে এসে শুয়ে থাকে, তাড়ালেও যায় না।'

এই বলে তারা হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। সায়েব বললেন, 'কি জ্বালা! বাঘ এসে তোমাদের ঘরে রাত কাটাবে, তাতে আমার কি!' এই বলে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেলেন।

boiRboi.net

বেড়ালের কথা

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছিলাম আস্তাবলের মধ্যে বাবার কালো টাট্টুঘোড়া আর আস্তাবলের পাশে জালের খাঁচায় গোটা দশেক মুরগি ছাড়া, শখ করে কোনো জানোয়ার পুষতে হয় না। কারণ তারা বড় নোংরা হয়, রোগের জীবানু ছড়ায়, গায়ে গন্ধ ইত্যাদি। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম এরাও নোংরামিতে কম যেত না। আস্তাবল সাফের জন্য মস্ত কোদাল কেনা হল। আস্তাবলের পাশে একটা ছোট-খাটো পুকুর খোঁড়া হল এবং দেখতে দেখতে সেটি ভরে গিয়ে মাটি চাপা হল। তারপর তার পাশে আরেকটা খোঁড়া হল। আর মুরগির ঘরের কথা কিছু না বলাই ভালো। ডিমের খোঁজে সেখান থেকে একবারটি ঘুরে ঘরে এলেই, বড়রা সবাই নাকে কাপড় চেপে বলতেন, 'উঁ—উঁ! বাইরে যা, বাইরে যা।'

তবে টাট্টু ঘোড়া চেপে বাবা পাহাড়ে বনে জরিপের কাজ করতেন আর মুরগিরা ডিম তো দিতই, উপরন্তু ভোর থেকে মোরগরা কুঁড়েদের ঘুম ভাঙাত। কাজেই তাদের কথা আলাদা। বাকি সব জানোয়ার বাতিল। এদিকে একটা ছাই রঙের উটকো বেড়াল, রোজ রাতে স্কাই-লাইট্ দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার পায়ের কাছে কম্বলের তলায় ঘুমনো ধরল। গোড়ায় খুশিই হয়েছিলাম, আমার পা-দুটো গরম থাকত।

তারপর একদিন রান্নঘরের শিকে থেকে দু-দিনের মাছ-ভাজা যেদিন অদৃশ্য হল, আমারো চৈতন্য হল। স্কাই-লাইট বন্ধ করলাম। তারপর কত বছর কেটে গেল, ছাই বেড়ালের কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। কিন্তু নিজের ঘর-সংসার হয়ে অবধি বুঝলাম, অবাধে যার কাছে মনের সব কথা বলা যায়, অথচ যে কোনো মন্তব্য করে না, এমন সঙ্গী সব মেয়েদেরই দরকার। একজন কয়েকটা খলসে-মাছ পাঠিয়েছিল। মনের মধ্যে একটা পুরনো পিপাসা ছিল, তাই তাদের মধ্যে থেকে সব চাইতে বড় আর সব চাইতে সুন্দর দুটিকে পুষলাম। প্রথম প্রথম তাদের গা থেকে রামধনু রং ছিটোত। কিছুদিন পরে সে-সব বন্ধ হল। বড় একটা মুখ-খোলা (অর্থাৎ ঢাকনি ভাঙা) কাচের বোয়মে রাখতাম, ভাতটাত খেতে দিতাম, তাজা সবুজ শাকপাতা জলে ফেলে রাখতাম, দুটো সুন্দর নুড়িও জলের নিচে শোভা পেত, কত যে যত্ন করতাম তার ঠিক নেই।

এত আদরে খুবই সুখে শান্তিতে ওদের দিন কাটা উচিত ছিল। কিন্তু তা না, কেবল কামড়াকামড়ি করত। প্রায়ই এ ওর পাখনার, কিংবা কানকোর টুকরো খুবলে আনত। তারপর যখন একটা মিছিমিছি মরে গেল আর অন্যটাকে রাতারাতি কিছুতে জানলা দিয়ে ঢুকে, বোয়ম উল্টে ফেলে খেয়ে গেল, তখন সত্যি কথা বলতে কি,

খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। উল্টে পড়ে বোয়মটাও ভাঙল।

এর কিছুদিন বাদে একটা চার ইঞ্চি মাপের কচ্ছপ পুষেছিলাম। ঐ একই নিয়মে চ্যাপটা ফুলদানিতে রাখলাম। ভালো নিয়ম, ছাড়তে হয় না। বেশ শান্তিতেই থাকা গেছিল। খালি একদিন ওকে সাবান মাখিয়ে স্নান করাবার চেষ্টা করতেই, খ্যাঁক করে কামড়াতে এসেছিল। ভাগ্যিস সময় থাকতে হাত সরিয়ে নিয়েছিলাম, নইলে আর দেখতে হত না। সেটাও একদিন রাতারাতি উধাও হল, তবে বেড়ালের সাহায্যে কি না বলতে পারলাম না। এর পর বহু বছর আর জন্তু-জানোয়ার পুষিনি।

এদিকে থাকতাম মধ্য-কলকাতার একটা ফ্ল্যাটে। নিচের তলায় ছিল খাবার জিনিসের এক মস্ত দোকান। তাদের বড় বড় ভাঁড়ার ছিল। সেখানকার হিমঘরে নানা রকম গন্ধওয়ালা চিজ, শুকনো মাছ, নোনা মাংস ইত্যাদি রাখা হত। তার মধু-গন্ধে হাজার হাজার নেংটি ইঁদুর এসে জুটত। যে একবার আসত, সে আর কখনো ফিরে যেত না। দেখতে দেখতে তারা বাড়ির ছত্রিশটি ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে পড়ল। টেকা দায় হয়ে উঠল।

এই সময় যে-কারণেই হোক, একটা আধা-বয়সী হুলো বেড়াল এসে আমাদের বাড়িতে উঠল। উঠল তো উঠল, আর গেল না। প্রথমটা তাকে তাড়াবার চেষ্টা করলেও, কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ঘরগুলো যখন ইঁদুরশূন্য হয়ে গেল, লোকে আমাদের হিংসে করতে লাগল। হুলোর নাম দেওয়া হল নেপোলিয়ন, ওরফে নেপো।

নেপো সারাদিন শুধু খেত আর ঘুমোত। এত খেত যে কখনো ইঁদুর ধরতে দেখা যেত না। কিন্তু বোধ হয় ওর গায়ের গন্ধেই সব ইঁদুর পালিয়েছিল।

সারাদিন আরাম করত আর সারা রাত টহল দিয়ে বেড়াত। মাঝে মাঝে গলিতে-টলিতে বিচিত্র বেড়ালীয় রাগিণী শুনে স্পষ্টই বোঝা যেত যে ওদের একটা ক্লাব আছে এবং সম্ভবতঃ নেপোই তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। একবার সদস্যদের বারো-চোদ্দজনকে দেখেওছিলাম, পাশের বাড়ির পেছনের কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে, চীনে হোটেলের রান্নাঘরের পেছনের দরজার দিকে তাকিয়ে, চুপ করে বসে আছে। ভোরে নেপো যখন বাড়ি ফিরত, বিজয়-গর্বে ফিরত। সারা গায়ে আঁচড়-কামড়ের দাগ নিয়ে। আমরা আর্নিকা লাগাতাম।

এমনিতে বেশ ভালোমানুষ সেজে থাকত, কিন্তু অন্য কোনো বেড়াল—মনে হত ওদের ক্লাবের বেড়াল হলেও—আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে এলেই, লোম ফুলিয়ে তিনগুণ বড় হয়ে, ফ্যাঁশ্-ফ্যাঁশ্ শব্দ করতে করতে তাদের তাড়া করত। বাড়ির পাঁচিলে কাগ বসলে, তার ল্যাজের পালক খুলে নিত। চড়াই এলে খেয়ে ফেলত। টিকটিকি মাকড়সা ইত্যাদি ছাদ থেকে নিচে নামত না।

আমাদের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও আমাদের বিছানায় উঠে শুত। তাই প্রতি রবিবার ওকে ধরে জীবানু-নিবারক সাবান মাখিয়ে, গরম জলে স্নান করানো হত। ও কিছু বলত না, মনে হত আরাম লাগছে।

চেহারার কথা আর কি বলব। প্রায় একটা পাঁঠার ছানার মতো বড়, পোড়া-হাঁড়ি-পানা মুখ, কান দুটো চিবোনো ধরনের। তাতে কি? এই নিয়েই ম্যাও-ম্যাও করে বাড়িময় ঘুরে বেড়াত। কখনো চুরি করে খেত না। হয়তো সব সময় পেট ভরা থাকত বলে। আদর নেবার বা আদর দেবার কোনো চেষ্টাই ছিল না। পেট ভরে খেতে আর কারো একটা আরামের বিছানা পেলে, নেপো আর কিছু চাইত না।

এই নেপো অমাদের বাড়িতে প্রায় দশ বছর ছিল। শেষটা যখন বুড়ো হল, সারাক্ষণ রান্নাঘরে পড়ে থাকত। মনে হত বোধ হয় গেঁটেবাতে ধরেছে, চলতে-ফিরতে কষ্ট হচ্ছে। কানে হয়তো শোনে না, চোখেও ভালো দেখে না। মুখের কাছে যা ধরে দেওয়া যেত, সোনাহেন মুখ করে চেটেপুটে খেয়ে নিত। তবু ওর গায়ের গন্ধে বাড়িতে একটাও নেংটি ইঁদুর ছিল না।

সে যাই হোক, সারাদিন চুপচাপ পড়ে থাকত, সন্ধ্যে হলেই একবার শরীরটাকে টেনে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এক পাক ঘুরে আসত। ফিরে এসে আমাদের ফ্ল্যাটের পেছনের দরজার তলার দিকে, ইঁদুররা এক সময় যে ফুটো করেছিল, তার মধ্যে দিয়ে থাবা ঢুকিয়ে দরজায় আঁচড়াত আর ম্যাও-ম্যাও করে ডাকত। অমনি কেউ না কেউ ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিত। দেখা যেত নতুন নতুন আঁচড়-কামড়! আমাদের সে কি দুঃখ!

আগে যারা ওর ভয়ে আমাদের বাড়ির ধারে-কাছে ঘেঁষত না, আজকাল তারা কার্নিশে—পাঁচিলে বসে মজা দেখে। আমরা ঠেঙা নিয়ে তাদের তাড়াতাম। তারাই বোধ হয় নেপোকে নিচে একা পেয়ে তার শোধ তুলছে! নেপোকে কোলে নিয়ে, রক্ত ধুয়ে, আর্নিকা লাগানো হত।

তারপর একদিন বিকেলে আমি গাড়ি করে বেরোচ্ছি, দেখি একতলার পাঁচিলের ওপর দিয়ে, একটার পেছনে একটা, দশটা হুলো বেড়াল আকাশের দিকে ল্যাজ খাড়া করে চলেছে। তাদের সবার আগে নেপো!! রামভুজের যত ভাবনা, 'দেখলেন, মা? বেচারি চোখে দেখে না, কানে শোনে না, হাঁটতে পারে না! এখুনি কি বিপদে পড়বে। ওকে বরং বাড়িতে রেখে আসি।'

এই বলে রামভুজ হাত বাড়িয়ে নেপোর ঠ্যাং ধরে এক টান দিল। খান কুড়ি বাঁকা নখ বের করে, নেপো বলল, 'ফ্যাঁচ্!' এই বলে এক লাফে ১০নং ফ্ল্যাটের মেমের রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ওর পেছন পেছন বাকি ন-টাও ঢুকল। দুমদাম ঝনঝন শব্দ, চিৎকার, দৌড়োদৌড়ি।

রামভুজ বলল, 'আমরা বরং রওনা দিই।'

boiRboi.net

গিন্নিদের প্রসঙ্গে

আমার বিয়ে হবার পরেই দেখলাম যে আমার মা-মাসিদের সহপাঠিনী যে-সব গিন্নিদের এতকাল আমি মাসি-পিসি বলে ডেকে এসেছি, তাঁরা সবাই এখন সম্পর্কে আমার ননদ হলেন। বললেন, 'এখন থেকে আমাদের দিদি বলে ডাকবি।'

শুধু তাই নয়, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁরা সব দিদির মতো এবং প্রায়-সমবয়সী দিদির মতো ব্যবহারও করতে লাগলেন। নিজেদের এবং পরস্পরের শাশুড়িদের আর স্বামীদের বিষয় এমন সব রোমাঞ্চময় কথা আমার কানে ঢালতে লাগলেন যে তাঁদের সমবয়সী ভাবা ছাড়া আমার উপায় রইল না।

তাঁদের অনেকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কৈশোর থেকে হাসি-তামাসা করে এসেছি, এখন হয়ে গেলাম কারো কাকী, কারো মামী, কারো ছোট-দিদিমা! কেউ কেউ বয়সে অনেক বড়-ও ছিল, হয়তো দশ-বারো বছরের বেশি বড়, তারাও সম্পর্কে ছোট হওয়াতে, পদ্যপাঠ পায়ের ধুলো নিয়ে বলতে শুরু করে দিল, 'কবে মা-বাবাকে হারিয়েছি, এখন বলতে গেলে, মাথার ওপর খালি তোমরাই রইলে!'

এই সব নিকট আত্মীয়-কুটুম্বদের কাছে থেকে আমি সংসার করার প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। আর সত্যি কথা বলতে কি এমন অকপট স্নেহ তাঁরা এমন দরাজ হাতে

ঢেলে দিয়েছিলেন যে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম।

একদিন আমার ন-ঠাকুরঝি বললেন, 'তুই যে কত ভাগ্যবতী তা জানিস না। তোর শাশুড়ি নেই!' আমার ঐ শাশুড়িটিকে নিয়ে আমি সারা জীবন হয়রান হয়েছি! সেই তাঁর শেষ চোখ বোজা পর্যন্ত। এই খাইয়ে-দাইয়ে, আঁচিয়ে, মুখশুদ্ধি মুখে দিয়ে নিজে খেতে গেলাম। এর মধ্যে তাঁর কোনো আত্মীয়া এলেন দেখা করতে, তাকে হয়তো বললেন, "সেজ-বৌমার সব ভালো, খালি ঐ আমাকে খেতে দেয় না! কাল রাত থেকে এই বেলা অবধি শুকিয়ে রেখেছে!" তাই শুনে আত্মীয়াটি হাত-পা ছুঁড়ে একাকার! কিন্তু ভার নেবার বেলায় কেউ কোথাও নেই—!' এই অবধি বলে হয়তো আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'পুজোয় ভাগ্নে-ভাগ্নীকে কি দিবি বল্? জানিস্ তো শাস্ত্রে আছে এক ভাগ্নেকে কিছু দিলে, একশো বামুনকে খাওয়ানোর ফল দেয়!' বলা বাহুল্য ভাগ্নেটির প্রায় আমার সমান বয়স, ভাগ্নী কিছু বড়! এমনি করে একটু একটু করে সংসার করার পাঠ নিতে লাগলাম।

এম-এ পাস্ করেছি। এক বছর শান্তিনিকেতনে, এক বছর কলকাতায় অধ্যাপনা করে কাটিয়ে সংসার সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হলেও, প্রশিক্ষণের যে অনেক বাকি, সেটা টের পেলাম কলকাতার এক নাম-করা মহিলা-সমিতির সদস্যা হয়ে। আজ পর্যন্ত সেই সব মহিলাদের আমি এমনি ভয় করি যে নাম করবার সাহস হল না।

মোট কথা তাঁরা ভালো ভালো জামা-কাপড় পরে, একেকবার একেকজন অতিথি-পরায়ণ সদস্যার বাড়িতে মিটিং করতেন। সেই সব মিটিং-এ নানা সৎ-কাজের পরিকল্পনা হত। কয়েকটা শিল্প-কেন্দ্র, ত্রাণ-কেন্দ্র চালানো হত। মঙ্গল-কার্যের উদ্দেশ্যে টাকা তোলা হত। যদি শোনা যেত সরকার, বা কোনো সরকারি, বা বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান নারীদের ওপর অবিচার বা অন্যায় করেছে, অমনি সকলের সই নিয়ে বড়-লাটের দপ্তরে আপত্তি জানানো হত। আর বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, অনেক সময়ই তার ভালো ফল দেখা যেত।

একবার মনে আছে, কয়েকজন জবরদস্ত সমাজ-সেবিকার সঙ্গে উত্তর কলকাতার কোনো বিশিষ্ট খবরের কাগজের আপিসে গিয়ে, নারী-কল্যাণ সমিতিগুলোর সততা সম্বন্ধে বিশ্রী ইঙ্গিতপূর্ণ সম্পাদকীয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেছিলাম। সম্পাদক আবার জ্যাঠামশাইদের চিনতেন।

আমার সঙ্গী গিন্নিরা কিছুক্ষণ 'আপনাদের কি মা-বোন নেই?' গোছের প্রতিবাদ জানাবার পর, সম্পাদকমশাই আমার দিকে ফিরে হঠাৎ বললেন, 'বুঝতে পারছি, খুব অন্যায় করে ফেলেছি। ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে অন্যায়টা করেছি। আপনি সঠিক তথ্য দিয়ে আপনাদের কাজ সম্বন্ধে যা যা লিখে দেবেন, আমরা হুবহু তাই ছাপব।' তাই লিখে দিয়েছিলাম, ওঁরা ছেপেও ছিলেন। সাংবাদিকরা সবাই মন্দ নয়।

এই প্রসঙ্গে আমার জন্মের অনেক আগের একটা ঘটনা আরেকবার না বলে পারছি না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সমাজ-উন্নয়ন কর্মের প্রথম যুগ। কোনো একটা

banglainternet.com

রক্ষণশীল কাগজে, শিক্ষিত মেয়েদের সম্বন্ধে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল।

তখনো মেয়েরা নিজেদের হয়ে লড়তে শেখেনি, কিন্তু তাদের হয়ে লড়বার লোকের অভাব ছিল না। আমার মেজ-জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের শ্বশুর দ্বারিক গাঙ্গুলী, ঐ সম্পাদকীয়টুকু কেটে পকেটে নিয়ে, হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে কাগজের আপিসে সম্পাদকের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

হঠাৎ অমন গম্ভীরমুখো লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ পুরুষকে দেখে, সম্পাদক একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'তা আপনি কেন এসেছেন?' দ্বারিক গাঙ্গুলী হাসলেন, 'এসেছি আপনাকে আপনার কথা গিলিয়ে খাওয়াবার জন্য। টু মেক্ ইউ ঈট ইয়োর ওয়ার্ড্স্!'

এই বলে সম্পাদকীয়টুকুকে গুলি পাকিয়ে, জল দিয়ে গিলিয়ে, বলেছিলেন, 'কাল ঐ সব কথা প্রত্যাহার করে সম্পাদকীয় না বেরোলে, অন্য এবং আরো শক্ত ওষুধ দিতে হবে।' বলা বাহুল্য ঐ সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল।

boiRboi.net

সে যাই হোক, নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের পেছনে পেছনে আরেকটা বেশ জোরালো প্রবাহ চোখে পড়ত। আমাদের সমিতির মিটিং উপস্থিত যে বাড়িতে হত, সে-বাড়ির গৃহস্বামিনী যদি তার আগের মিটিং-এর গৃহস্বামিনীর চেয়েও ভালো জল-যোগের ব্যবস্থা না করতেন, তা হলে তাঁর বড় লজ্জা হত। মাঝে থেকে আমাদের সুবিধা হত।

চা খেতে খেতে দেখতাম যে যার নিজের স্বামীর চুটিয়ে নিন্দা করছেন—'বাইরে থেকে দেখতে ঐ রকম ভালো, টাকাকড়ি রোজগার-ও মন্দ করেন না ; কিন্তু যে ওঁর সঙ্গে ঘর করেনি, সে বুঝবে না কি কঠিন ব্যাপার। ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই মার্চের মধ্যে হাজার গরম পড়লেও পাখা চালাবার জো নেই ! যে-সব জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না, সেই সব জিনিস, যে-দামে তা কখনো পাওয়া সম্ভব নয়, সেই দামে এনে টেবিলে দিতে হবে ! আয়া জবাব দিয়েছে তো আরেকটা আনো। ছয় মাসে তো এমনিতেই ষোলটা এল গেল !'

মনে পড়ে গেল আমার স্বামী কোন বাড়ির গিন্নির গল্প বলেছিলেন। তিনি সখীদের কাছে মুখ উঁচু করে বললেন, 'আমাদের বাড়ির ওনার বারোমাস ল্যাংড়া আম খাওয়া চাই !' শ্রোতারা বললেন, 'ওমা, তাই কি পাওয়া যায় নাকি ?' গিন্নি বললেন, 'তা বললে তো চলবে না। ওনার অব্যেস !'

আরো বলি গিন্নিদের কথা। একবার আমার নন্দাই, বিখ্যাত বাঘশিকারী কুমুদ চৌধুরী এসে বললেন, 'জামাই-বাড়ি গিয়ে অবধি সেজবৌ চিঠি দেয়নি। তবে এবার চারপাতা ঠেসে লিখবে সন্দেহ নেই। কারণ আমি লিখেছি রবিবার ফুল-বৌ নেমন্তন্ন করে মোচার ঘণ্ট রেঁধে খাইয়েছে। অমন আমি জীবনে কখনো খাইনি !'

তবে এ কথা সত্যি যে স্বামীরা অন্য বাড়ির গিন্নিদের বড় বেশি প্রশংসা করেন। তারা রাঁধে ভালো, কি কম খরচে কি সুন্দর করে ঘর সাজায়, ছেলেমেয়েদের কি সুন্দর শিক্ষা দেয়, কি ঠাণ্ডা মেজাজ, কি মিষ্টি কথা, হেনাতেনা কত কি, যা শুনলে যে-কোনো স্বাভাবিক স্ত্রীর হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। এ-সব ক্ষেত্রে হাঁড়িপানা মুখ করে ঘর থেকে চলে যাওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই প্রসঙ্গে একটা বিলিতী গল্প শুনুন। বাস্ থেকে নেমেই স্বামী বললেন, 'তোমার ও-পাশের মহিলাকে লক্ষ্য করেছিলে ? তোমার বয়সী হয়তো কিন্তু কে বলবে—'

স্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, 'কার কথা বলছ ? ঐ যে নখের পুরনো পালিস্ না তুলেই নতুন পালিস্ লাগিয়েছে ?' 'তা তো দেখিনি—' 'ঐ তো যার চুলের গোড়ার দিকে আসল রং বেরিয়ে পড়ছিল ?' 'তাই নাকি ?' 'আরে ঐ যে হলুদপানা গায়ের রঙের ওপর বেগুনি পোষাক পরে বাহার দিচ্ছিল ? ওর নিশ্চয় পেট পরিষ্কার হয় না।' 'দেখ অত দেখবার সময় কোথায় পাব ? কিন্তু কি সুন্দর চলাফেরা—' 'সময় পাওনি আবার কি ? ঐ যে মহিলা পায়ে এক সাইজ ছোট জুতো পরেছিল। জুতোর রং এক, ব্যাগের রং আর, বলিহারি ! আবার ন্যাকার মতো আড়চোখে তাকাচ্ছিল !

boiRboi.net

তাও যদি গলায় বোতামটা ভাঙা আর হাতঘড়িটা ৫ মিনিট স্লো না হত। না, আমি তাকে লক্ষ্য করিনি। আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই!'

জ্যাঠাইমার অর্থনীতি

যখন কলেজে পড়তাম, তখন অর্থশাস্ত্রের প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পাতায় লেখা ছিল—মানুষের অনুশীলনের প্রধান বিষয়বস্তু হল মানুষ। কি রকম মানুষ? না, তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কাজে নিবিষ্ট মানুষ। তা সে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রাটি কি ব্যাপার? না, বেচা-কেনা ছাড়া কিছু নয়। কি রকম বেচা-কেনা? না, সব চেয়ে কম দামে কিনে, সব চেয়ে বেশি দামে বেচা। এই হল মানুষের প্রাত্যহিক অনুশীলনের বিষয় এবং এরি ওপর নির্ভর করছে কে বড়-লোক হবে আর কে হবে গরীব। অর্থাৎ মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

আমার জ্যাঠশাশুড়ি ছিলেন সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ বিহারীলাল ভাদুড়ীর মেয়ে এবং আরেক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী। লেখা-পড়া না জানলেও, এ-সব জটিল ব্যাপারের ওপর তাঁর একটা জন্মগত দখল ছিল।

হ্যাঁ, বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম যে এর ওপরে তিনি ছিলেন আমার পটোদিদির মা। তাঁকে ঠকানো খুব শক্ত ছিল। থাকতেন কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে ; ওঁদের বাজার হত হাতিবাগানে। তিনি নিজেই যে সব কেনাকাটা করতেন, তাও নয়। তবে বাজারের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে যতটা করা যায়, এই আর কি।

একবার আলুর দোকানের সামনে গাড়িতে বসে শুনলেন আলু-ওয়ালা অন্য একজন খদ্দেরকে বলছে, আলুর দর হয়েছে নাকি চার পয়সা সের। জ্যাঠাইমার চক্ষু চড়ক গাছ! 'বলিস্ কি রে! এ যে দিনে ডাকাতি!' সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন 'চেতলা চল।' তিন পো শহর পেরিয়ে, চেতলার বাজারে গিয়ে দশ সের আলু আর দশ সের পেঁয়াজ কিনে সগর্বে বাড়ি ফিরলেন।

সওদা দেখে বৌমার চক্ষুস্থির! 'আচ্ছা মা, এই যে বললাম বাড়িতে আধ বস্তা আলু আর আধ বস্তা পেঁয়াজ ছাড়া কিছু নেই। এখন আমি কি দিয়ে কি করি?" বৌমার এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পেয়ে জ্যাঠাইমা-ও গরম হয়ে উঠলেন, 'বিষয়-

আশয় তোদের হাতে পড়লে, কি অবস্থাটা হবে বল্ দিকিনি ! হাতিবাগানের দোকানদার এমনি দুষ্টু যে এক বেচারিকে বলছে আলুর দর নাকি চার পয়সা সের—'

বৌমা বাধা দিয়ে বললেন, 'আলুর যখন দরকার নেই তখন দর জানতে চাইলেন কেন ?' জ্যাঠাইমা বললেন, 'আহা, জানতে চাইনি ! দোকানদার অন্য একটা লোককে বলছিল, কথাটা কানে ঢুকে গেল। আমি কি উট, যে কান বন্ধ করে রাখব ! তা সে লোকটা বলল ফুলির-মা বলে কে যেন চেতলায় তিন পয়সা সের আলু কিনেছে। তখন চেতলায় না গিয়ে কি করি ? সুযোগ কখনো ছাড়তে হয় ?'

বৌমাও ছাড়বার মেয়ে ছিলেন না, তিনি বললেন, 'ঐ এক পয়সা বাঁচাতে এক টাকা দিয়ে এক গ্যালন পেট্রল পুড়িয়ে চেতলায় গিয়ে তিন পয়সা সেরে কতকগুলো অ-তরকারি আলু কিনে আনলেন ?'

তখন জ্যাঠাইমা বিজয়-গর্বে মাথা উঁচু করে বললেন, 'তাহলে তুই কিছুই বুঝিস্ না রে মা। এক সঙ্গে দশ সের আলু কিনলে চার-চারটে পয়সা ছেড়ে দেয় আর সেই সঙ্গে পাঁচ পয়সা সেরে দশ সের পেঁয়াজ কিনলে, চারটে পেঁয়াজ ফাউ দেয়। এবার বল্ কি রকম সুবিধেটা হল ! তবে এই যা দুঃখ যে আলুটা কিছুতেই তিন পয়সায় দিল না আর পেঁয়াজটা হাতিবাগানে চার পয়সা বলছিল।'

বৌমা হতাশ হয়ে ঠাকুরকে ডেকে বললেন, 'তুমি বরং খানিকটা ছোলার ডাল ভিজিয়ে ধোকার ডালনা কর।' এই কি তবে সস্তায় কিনে বেশি দামে বেচা ? তবে পাঠ্যপুস্তকে সব কথা লেখেনি। তবে ঐ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সুবিধাটা যারা কিনবে তাদের জন্য নয়, যারা বেচবে তাদের জন্যে।

পরে জ্যাঠাইমা থিয়েটার রোডে থাকতেন। সেখানে অনেক জায়গা-জমি ছিল। তাই গরু কেনা হল। বলা বাহুল্য গরুর যেমন আদর-যত্ন হত, দুধ-ও দিত তেমনি বালতি ভরে। অবিশ্যি মেয়ে-বৌদের খাটুনিও তেমনি বেড়ে গেল। কারণ জাব কোটা থেকে সবই তাদের দেখতে হত, নইলে গয়লারা কি করে বসবে তারি বা ঠিক কি ? 'গেরস্তর বাড়িতে দুধে জল ঢাললে পাপ হয়। বুঝলে বৌমা ?'

ভোর থেকে তাঁর মেয়ে-বৌরা গরু নিয়ে নাজেহাল হত। শেষটায় গরু দোয়া হল ; বালতি ভরে রান্নাঘরে এনে, ছেঁকে কড়াইতে ঢালা হল ; দুধ ফুটতে আরম্ভ করল ; চারদিক তার সুগন্ধে আমোদিত হল। বৌ-ঝিরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কেউ এক ফোঁটা জল মেশাবার সুযোগ পায়নি। বাবা ! শেষটা যদি গেরস্তর অকল্যাণ হত !

ঠিক এমনি সময় একটা বড় এক সেরি ঘটি হাতে জ্যাঠাইমা এসে বললেন, 'দেখি, একটু সর তো দেখি !' এই বলে ফুটন্ত ঘন দুধে এক ঘড়া জল ঢেলে দিয়ে বললেন, 'এতে গেরস্তর কিঞ্চিৎ সাশ্রয় হয় !'

তবে একবার জ্যাঠাইমা বাস্তবিক একটা অসম্ভব কাজ করে ফেলেছিলেন। থিয়েটার রোড দিয়ে এগিয়ে গেলে, এখন যেখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, তখন সেখানে খোলা মাঠ ছিল। সেখানে পৌঁছে, গাড়ি থামিয়ে জ্যাঠাইমা বৈকালীন হাওয়া খাচ্ছেন

BanglaBook.org

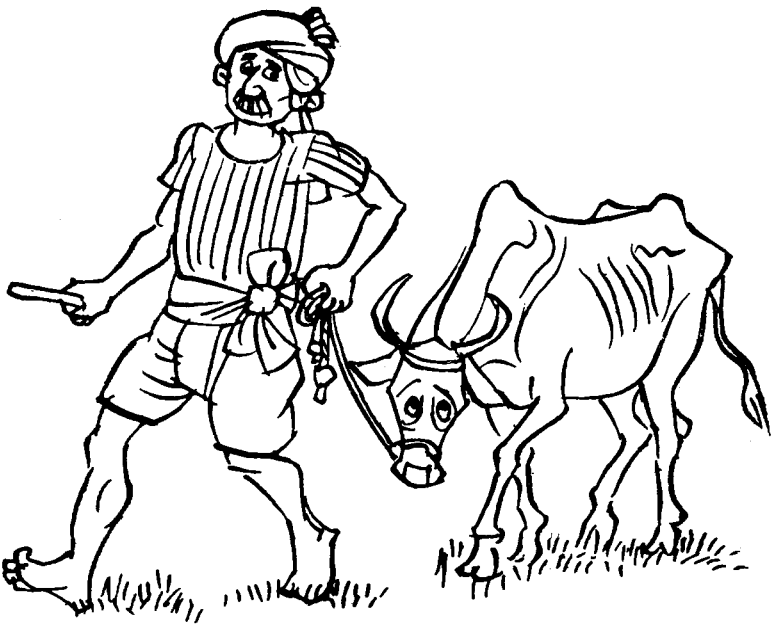

এমন সময় দেখলেন উল্টো দিক থেকে একটা লোক একটা গরুকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।

হাড় জিরজিরে রুগ্ন গরু ; বেচারি চলতে পারছে না, মাথা ঝুলে যাচ্ছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। জ্যাঠাইমা হিন্দী জানতেন না। তবু ঠেকায় পড়ে বললেন, 'কাইকু উস্কো পেটাতা ? কাঁহা নিয়ে যাতা ?'

লোকটা যা বলল তার বাংলা মানে হল, 'গরু ভারি বদমায়েস। বাচ্চা দেয় না, দুধ দেয় না, খালি খেতে চায়। তাই ওকে কসাইয়ের কাছে বেচতে নিয়ে যাচ্ছে। শুনে জ্যাঠাইমা আঁৎকে উঠলেন, 'সে কত টাকা দেবে ?' লোকটা মওকা পেয়ে বলল, 'পঁচিশ দেবে নিশ্চয়।' জ্যাঠাইমা বললেন, 'ওকে নিয়ে আমার গাড়ির পেছনে পেছনে আয়। আমি পঞ্চাশ দেব।'

বাড়ির লোক চটে গেছিল। মড়াখেকো গরুর জন্য পঞ্চাশ টাকা ! জ্যাঠাইমা কারো কথা শোনেননি। পশু-চিকিৎসক এসে ওষুধ-পত্র দিয়ে গেল। ভালো খাবার আর ওষুধ পড়তেই দেখতে দেখতে তার কি চমৎকার চেকনাই চেহারা হল। বেশি বয়স ছিল না গরুটার, অযত্নে অমন দেখাচ্ছিল। পরের বছর সে সুন্দর বাচ্চা দিল আর

BanglaBook.org

রোজ সকালে সাত সের বিকেলে পাঁচ সের দুধ দিত। তাতে জল মেশানো হত কি না ঠিক জানি না।

বইপাড়া

সবাই বলে বই-পাড়া। মেয়েদের সেখানে খুব একটা দেখা যায় না। মেয়েরা বই পড়ে, বই কেনে, বই পড়ায়, বই লেখে, বইয়ের সম্পাদক প্রকাশক পর্যন্ত হয়, অথচ বই-পাড়ার বইয়ের দোকানে তাদের খুব কম দেখা যায়। অবিশ্যি তা সত্ত্বেও ঐ নারী-বিবর্জিত ঘন বনে রোমাঞ্চের এতটুকু অভাব নেই। সত্যি কথা বলতে কি উটি হল কলকাতা শহরের সব চাইতে চাঞ্চল্যকর জায়গা। খুব একটা বিস্তৃত অঞ্চলও নয়। এই ধরুন কলেজ স্ট্রীট আর মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগ স্থলে কম্পাসের খোঁচামতোটাকে গেড়ে, যদি সেখান থেকে কলুতলার মোড় অবধি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা গোলমতো আঁকা যায়, তাহলেই বই-পাড়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গাগুলো ওর মধ্যে পড়ে যাবে। অবিশ্যি ইদিকে-উদিকে কিছু শুঁড়টুড় বেরিয়ে থাকবে! এই অঞ্চলের মধ্যে আবার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হল শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট বলে একটা রাস্তা, যেখান দিয়ে চারজন মোটা মানুষ পাশাপাশি হাঁটলে, অন্য পথচারীদের কাঁকড়ার মতো পাশ ফিরে এগোতে হবে।

ঐ রাস্তার প্রত্যেকটি বাড়িতে বোধ হয় তিন থেকে পাঁচটি বইয়ের দোকান। সব চাইতে ভালো ব্যাপার হল যে সেখানে বই বেচা-কেনা ছাড়া আর কিছু হয়ও না, হবার চেষ্টাও থাকে না, দরকারও নেই। যাদের মেঝে থেকে ছাদ অবধি থাকে থাকে শুধু নতুন নতুন বই, তাদের আবার ঘর সাজাবার কি দরকার?

অবিশ্যি 'কিছু হয় না' ভুল বললাম। কারণ ভারি মনোহর অতিথি আপ্যায়ন হয়। এত বেশি অতিথি-বৎসল মানুষ এত কাছাকাছি পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। তাছাড়া উৎকৃষ্ট সন্দেশের দোকানও নিশ্চয় আছে, কিন্তু কোথায় আছে চোখে পড়ে না।

একটা বাড়ি আছে ঐ রাস্তায়, তার একতলায় সামনের ঘরগুলোতে অপেক্ষাকৃত বড় বইয়ের দোকান। তারি এক পাশে অন্দরে যাবার খিড়কি দোর। সেটা সর্বদা খোলা থাকে। সেখান দিয়ে ঢুকলে একটা উঠোনে পৌঁছনো যায়। সাবেকি উঠোন।

BoiRboi.net

এককালে কার গেরস্থালীর অন্দরমহল ছিল, এখনো দেখলে মন-কেমন করে। চার-দিকে রক্ বাঁধানো। সেই রকে বেশ কিছু বইয়ের দোকান। একজন পথ-প্রদর্শক ঐ পর্যন্ত আমার সঙ্গে গিয়ে, ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু দোকানে যারা ছিল, তারা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। কি দিয়ে যে আমাকে সুখী করবে তা তারা ভেবে পাচ্ছিল না। বই না, চা না, লিম্‌কো না, পান না। অন্য কিছু বই আমদানি করে দেবে? না, তাও না। মোট কথা বিশ্বনাথ বলে আমি যে সুন্দরপানা খোঁচা নাক, রোগা লোকটিকে ছাড়া, মনে হল দুনিয়ার যাবতীয় সামগ্রী

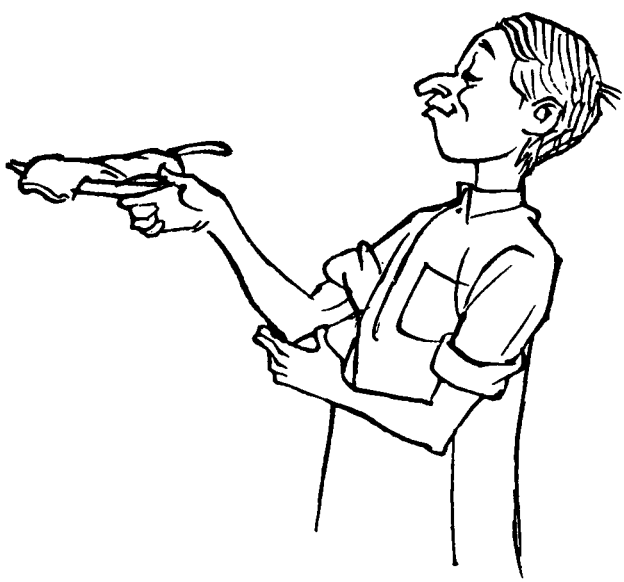

ওরা আমার জন্য এনে দিতে পারে। এমন কি আমি মিষ্টি খাই না শুনে, ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ চপ্-কাটলেটের প্রসঙ্গও তুলেছিল। শেষপর্যন্ত বিশ্বনাথ যে ব্যবস্থা করে দেবে ভেবেছিলাম, সম্পূর্ণ অচেনা একটি ছেলে তার সবই করে দিল।

ঐ রাস্তায় আরেকটা দোকান আছে, সে এত ছোট যে বইপত্র ছাড়া মাত্র তিনজনের জায়গা হয়। তাও একজনকে রাস্তার দিকে আর বাকি দুজনকে তার দিকে মুখ করে বসতে হয়। সে দুজনের নিচু টুল, অন্য জনের উঁচু আসন। নইলে তিন জোড়া হাঁটু রাখার জায়গা কুলোয় না। কিন্তু বড় ভালো জায়গা। ওখানে আমি জীবনের অনেকটা সময় কাটাতে রাজি আছি। অজেয় রায় বলে আমার চেনা একজন অপেক্ষা-কৃত কমবয়সী লেখককে একবার ওখানে দু-ঘণ্টা বসে কিছু পাণ্ডুলিপির সংশোধন

করে দিতে হয়েছিল। তিনি হাত-পা এলিয়ে দোকান জুড়ে বসে কাজ করছিলেন বলে তো আর প্রখ্যাত অতিথি-সৎকার বন্ধ থাকতে পারে না! কিছু পরেই দেখা গেল রাস্তায় টুল পেতে—ফুটপাথের বালাই-ও নেই, জায়গাও নেই—তার ওপর দাঁড়িয়ে, মালিকের ছেলে প্লেটে করে একটা গরম ডবল ডিমের মামলেট্ বাড়িয়ে ধরে আছে!

তাই বলে এ হেন স্বর্গেও যে হিংসাত্মক ব্যাপার ঘটে না এমন নয়। অকুস্থলের চাক্ষুষ দর্শকদের কাছে শুনেছি, কয়েক বছর আগে, বেলা গড়িয়ে যখন প্রায় বিকেল, তখন এক হাতে একটা করে নারকোল প্যাটার্নের জিনিস উঁচু করে ধরে, কয়েকজন ভদ্র চেহারার যুবকের আবির্ভাব হল। তাদের দেখে সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠতেই, তারা বলল, 'এগুলো নারকোল নয়, বোমা। যে যার নিজের জায়গায় বসে থাকলে কোনো ভয় নেই। কিন্তু রাস্তায় নেমে এলেই ইয়ে—!'

এই বলে বিশ্রী করে হাসতে হাসতে একটা বিশেষ দোকান থেকে সদ্য প্রকাশিত একটা বিশেষ বইয়ের যতগুলো কপি পেল রাস্তার মাঝখানে জড়ো করে, পা দিয়ে চেপে খানিকটা হাত দিয়ে ছিঁড়ে—অন্য হাতে সমানে নারকোল তুলে ধরা বলে সেটা কাজে লাগানো যাচ্ছিল না—কেরোসিন ঢেলে—হ্যাঁ, তখন পাওয়া যেত—অগ্নি-সংযোগ করে, আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ সেরে, যেমন নারকোল হাতে এসেছিল, তেমনি নারকোল হাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রতি বছরের মতো সেবারো আমি ওখানে নববর্ষ করতে গেছিলাম। সারা বছরে ঐটি আমার একটি প্রিয় অনুষ্ঠান। প্রথমে আনন্দ পাবলিশার্সে ডাবের জল আর বিনা-চিনির সন্দেশ। সেখান থেকে মিত্র ঘোষে দেখি মালিকদের প্রায় সবাই শুধু যে অদর্শন তা নয়, অন্য যাঁরা আছেন তাঁদেরো এমন একটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি, উস্কো-খুস্কো চুল আর পাঞ্জাবীর হাত গুটোনো, যা অতিথি-বৎসল গৃহস্বামীর মধ্যে একেবারেই শোভা পায় না।

অথচ আতিথ্যের ত্রুটি ছিল না। ক্ষীরের ছাঁচ খেল সবাই। রহস্যটি ক্রমে প্রকাশ পেল, যখন একটু গরম চেহারা নিয়ে কয়েকজন গুরুস্থানীয় ফিরে এলেন। শোনা গেল যে মোটা রিবেট দিয়ে একখানা বই ঐ একদিনের জন্য বিক্রি হবে। বইটিকে ধর্মবিষয়কও বলা চলে। তা দুপুরের মধ্যে ৫ হাজার কপির গোটা সংস্করণ শেষ। কিন্তু গলিতে তখনো হাজার দুই লোক। তারা আবার বইয়ের আন্দোলন করছে। আমার আবার ঐ গলিতেই তিন জায়গায় নেমন্তন্ন। তাছাড়া যথেষ্ট কৌতূহলও ছিল।

ওঁদের বারণ না শুনে গলিতে ঢুকে আমি থ! একটা নলের মধ্যে যদি তিন-চারটে দড়ি লম্বালম্বিভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, গলির প্রায় সেই অবস্থা। কিন্তু সেরকম চ্যাঁচামেচি শুনলাম না। কারণ মালিকরা ছাপ দেওয়া স্লিপ বিলি করতে শুরু করেছিলেন। সেই স্লিপ দেখালে সকলে নতুন মুদ্রণের বই পেয়ে যাবেন। মিত্র ঘোষের বইয়ের দোকানের গ্রিল মনে হল গায়ের জোরে বন্ধ করা হয়েছিল। তবে ততক্ষণে

পরিস্থিতিটা থিতিয়ে পড়েছিল।

আমি বলতেই আন্দোলনকারীরা পথ ছেড়ে দিলেন। গন্তব্য স্থানে গিয়ে দেখি দরজা ভেতর থেকে এঁটে বন্ধ। ততক্ষণে ভিড়ের মেজাজ ভালো হয়ে গেছিল। তাঁরা মহা উৎসাহে আমাকে সাহস দিতে লাগলেন, 'হাঁক পাড়ুন, দরজা পেটান। আমাদের ভয়ে সবাই ভেতরে বসে আছে। ধাক্কাধাক্কি করুন।' বলে সবাই হাসতে লাগল।

বাস্তবিক দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে, বললাম, 'ছি! ছি! ভীতু! কাপুরুষ! সিংহের সে তেজ কই?' বন্ধুরা বললেন, 'তা বলতে পারেন। কিন্তু যদি ইয়ে করে দিত!' বলেই একটা লিমকো আর এক বাক্স সন্দেশ উপস্থিত করলেন।

পরে বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিক ফাঁকা, শান্তিপূর্ণ, নববর্ষের মধুর গুঞ্জনে মুখর। আন্দোলনকারীরা কেউ কেউ পান কিনছেন। এমন রোমাঞ্চ আর কোথায় পাব?

দিলীপ

আজকাল যে শহরটাকে পুণে বলে, সেখানে একজন আশ্চর্য মানুষ থাকতেন। ৮০-র ওপর বয়স, লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি, মাথায় টাক, মোটা শরীর, কানে কম শুনতেন, শরীরও বেশ অক্ষম হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনিই ছিলেন এ-যুগের বাণীর বরপুত্র। বছর দুই হল তিনি পরলোকে গেছেন।

তাঁর নাম দিলীপকুমার রায়। ইদানীং লোকে তাঁকে নিয়ে আর মাতামাতি করত না। কারণ তিনি ধর্মের বিষয়ে ছাড়া গদ্যও লিখতেন না, কবিতাও লিখতেন না। আর যে মহৎ গুণের জন্য তাঁকে দেশকালোত্তর বলা যায়, যে ক্ষেত্রে তিনি একক আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই সঙ্গীত-ও ধর্ম বিষয়ে ছাড়া তিনি গাইতেন না।

এক হাজারের ওপর গান নিজে রচনা করেছেন। তার চেয়েও বেশি গানে সুর দিয়েছেন। কিছু কাল আগে রবীন্দ্রসদনে তাঁর ভক্ত-বন্ধুরা মিলে একটি গানের আসরের ব্যবস্থা করেছিলেন। বেশির ভাগ গান ও সুর-ই দিলীপকুমারের রচনা, কিছু তাঁর শিষ্যদের। অন্য রকম হাওয়া, অন্য রকম মেজাজ। দিলীপকুমার নিজে উপস্থিত থাকলে, তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের গুণে আর দেব-দুর্লভ কণ্ঠের মাধুর্যে সেই বিশেষ সন্ধ্যাটি সে বছরের, আর শুধু সে বছরের কেন, অনেক বছরের আর সব সন্ধ্যা থেকে দশগুণ উজ্জ্বল হয়ে মনের মধ্যে ধরা থাকত।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একমাত্র ছেলে দিলীপ যখন ছোট ছিলেন, তখন থেকেই যে তাঁকে দেখত সে-ই স্তম্ভিত হয়ে যেত। শেষ বয়সের দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখের রূপ বোঝা যাবে কি করে? কিন্তু ২৫ বছর আগেও, তাঁকে দেখলে চোখ ফেরানো যেত না। একটা মানুষ কি করে এত রূপ-গুণের অধিকারী হতে পারে ভাবতে গেলে, বিধাতার পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। টাকা-কড়িও যথেষ্ট পেয়েছিলেন ; সে সব দিয়ে-থুয়ে দিব্যি খালি হাতে জীবনটা কাটালেন।

যখন মা মারা গেলেন, দিলীপের বয়স পাঁচ। বাপের কাছে মানুষ। ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট্ বাপ হেদোর কাছে সুরধাম বলে নতুন বাড়ি করলেন। সেই বাড়িতে ছেলে-মেয়ে মানুষ হতে লাগল। বাপটিও তেমনি। তাঁর আর পুরো ম্যাজিস্ট্রেট্ হওয়া ঘটে উঠল না। যে বেপরোয়া নাট্যকার মেবার-পতন লেখে, তার চাকরি না গেলেই ঢের। নিকৃষ্টতা ম্যাজিস্ট্রেট্ হল ; উনি নাটক লিখে অমর হলেন।

বাড়িতেই খেলার মাঠ। সেখানে আত্মীয়-বন্ধুদের ছেলেদের সঙ্গে রোজ বিকেলে মহা দৌড়-ঝাঁপ খেলা-ধুলো হত। এক কুল্পি-বরফওয়ালা সুযোগ বুঝে রোজ রোজ বাকিতে ওদের কুলপি খাওয়াত। এমনি করতে করতে যখন প্রায় পঁচিশ টাকার দেনা হয়ে গেল, তখন এক দিন ব্যাটা সব টাকাটি চেয়ে বসল! দিলীপ আকাশ থেকে পড়ল। কুলপি খেয়েছে তো খেয়েছে, তাই বলে তার জন্যে একেবারে পঁচিশ টাকা!

ইদিক-উদিক তাকিয়ে দিলীপকুমার তার জ্যাঠতুতো দাদা মেঘেন্দ্রলালকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ঐ যে, ও দেবে।' মেঘেন্দ্রলালের চক্ষুস্থির! বয়সে সবচেয়ে বড় হলেও, তাকে সের দরে বেচলেও ওর অর্ধেক টাকা উঠবে না। বুদ্ধিমানের মতো সে তৎক্ষণাৎ সট্‌কান দিল।

এদিকে কুলপিওয়ালা মহা ক্যাঁওম্যাও লাগিয়ে দিল। সবচেয়ে খারাপ হল লোকটা বারবার ভয় দেখাতে লাগল যে আর কোনো-দিনও কুলপি খাওয়াবে না, বাবাকে বলে দেবে ইত্যাদি।

শেষে মরিয়া হয়ে দিলীপ বলল, 'তুমি একটু বস, আমি টাকা নিয়ে আসছি।' এই বলে পাঁই পাঁই ছুটে একেবারে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে দাদামশায়ের বাড়ি গিয়ে উঠল। সটাং দিদিমার কাছে গেল। এই দিদিমাই আমার সেই নাম-করা জ্যাঠ-শাশুড়ি। সে যাই হোক, দিদিমাকে দিলীপ বলল, 'তুমি না বলেছিলে তোমার কাছে রাতে শুলে, রোজ আমাকে এক টাকা দেবে?' দিদিমা বললেন, 'হ্যাঁ, দেবই তো!' দিলীপ বলল, 'তাহলে এক্ষুনি পঁচিশ টাকা দাও। আমি আজ থেকে পঁচিশ দিন তোমার পাশে শোব।' সঙ্গে সঙ্গে দিদিমা হাতবাক্স খুলে ওকে পঁচিশটা টাকা দিলেন। টাকা নিয়ে দিলীপ আবার পাঁই পাঁই করে ছুটে বাড়ি এসে, কুলপিওলার দেনা শোধ করল।

পরে যখন এই চমৎকার ব্যাপারটি দ্বিজেন্দ্রলালের কানে পেঁছিল, তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'সব তো বুঝলুম, কিন্তু আমার কাছে চাইলে না কেন?'

এ গল্প শুনেছিলাম মেঘেন্দ্রলালের কাছ থেকে। তিনি সেই চোর-ধরা হেমেন্দ্র-

লালের দাদা, মালবিকার জ্যাঠা ছিলেন।

বাপের প্ররোচনায় ১০-১১ বছর বয়সেই দিলীপ এক অসম্ভব কাজ করে ফেলেছিল। গোটা মহাভারতের চরিত্রদের একটা বংশ-তালিকা তৈরি করেছিল। সে কি চাট্টিখানিক কথা! বড় বড় ফুলস্ক্যাপ কাগজের সঙ্গে কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে, একটা বড় গোছের ঘরের সমস্ত মেঝেটা ঢেকে গেছিল। আরো যত লেখা হতে লাগল, নতুন নতুন কাগজ জোড়া হত। মধ্যিখানের কারো পরিচয় পরে জানা গেলে, সেটিকে যথাস্থানে বসানো ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। তলার কাগজ গুটিয়ে, হাঁটু দিয়ে হেঁটে, তবে ঠিক জায়গাটির নাগাল পাওয়া যেত।

দিলীপের সঙ্গে সঙ্গে তার সব বন্ধুবান্ধবদেরও মহাভারতের সব চরিত্রদের বংশ-পরিচয় শেখা হয়ে গেছিল। তাদের মধ্যে আমার স্বামীও ছিলেন, সম্পর্কে দিলীপের মামা, বয়সে এক মাসের বড়। তাঁর কাছেই এই গল্প শুনেছি।

মা ছাড়া মানুষ হলেও, অনাদরে মানুষ হয়নি দিলীপ। বরং মামা-বাড়িতে এত বেশি আদর আহ্লাদ পেত যে বেশ আবদারে হয়ে উঠেছিল। একবার খামোখা রাগ-মাগ করে দুপুরে ভাত খেল না। সবাই অনেক সাধ্য-সাধনা করল, তবু গোঁ ছাড়ল

banglainternet.com

না। তখন হাল ছেড়ে দিয়ে যে-যার খাওয়া সেরে নিজেদের ঘরে গেল।

মাঝখান থেকে দিলীপের সামনে সমস্ত দীর্ঘ দুপুরটা ঢিমে তেতালা-চালে পলে পলে কাটতে লাগল। বেজায় খিদেও পেতে লাগল। দিলীপ দেখল এ তো মহা জ্বালা! রাগ কখন পড়ে গেছে, অথচ আগে যারা এত সাধাসাধি করেছিল, সেই সব মানুষরা দিব্যি সুন্দর খেয়েদেয়ে ঘর অন্ধকার করে, ঘুমুতে গেছে!

দিন আর কাটতে চায় না। বিকেলে ওর দিদিমা উঠে দেখলেন, এখানে ওখানে, দেয়ালে, দরজার গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা, 'আরেকবার সাধিলেই খাইব!' তাই দেখে দিদিমার বুক ফেটে যাবার জোগাড়! এ-গল্প দিলীপকুমারের কাছেই শুনেছি। তারপর কি হয়েছিল, কে তাঁকে কি খাইয়েছিল, সে-কথা তিনি বলেননি।

মালিকানা

জিনিসপত্রের মালিক হওয়া চাট্টিখানিক কথা নয়; এর মধ্যে কত রকম সমস্যা যে ঢুকে যায় তার ঠিক নেই। আমাদের বন্ধু অশোকদা সেকালে একবার ট্রামে করে যাচ্ছেন। তখন ট্রামে মুখোমুখি দুখানা করে বেঞ্চি আড়ভাবে পাতা থাকত। কন্ডাক্টর পাদানিতে ঝুলে ঝুলে টিকিট দিত। অশোকদার সামনের বেঞ্চিতে একজন রোগা খিট্‌খিটে চেহারার ভদ্রলোক ব্রাউন-পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট খুব সতর্কতার সঙ্গে কোলে করে নিয়ে চলেছেন। থেকে থেকে অশোকদার দিকে সন্দেহের চোখে চাইছেন, আবার জিনিসটির কোল বদল করছেন।

অশোকদার বুঝতে বাকি রইল না যে উটি ওঁর প্রাণের প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে ওতে কি আছে জানবার জন্য অদম্য কৌতূহল হল। অথচ মালিকের যা তিরিক্ষে চেহারা, কিছু করবারও সাহস হল না। এমন সময় দেরিতে টিকিট নেওয়া নিয়ে কি একটা সামান্য কারণে কন্ডাক্টরের সঙ্গে রাগমাগ করে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। টিকিট-ও কিনলেন না আর বিস্ময়-বিহ্বল চোখে অশোকদা দেখলেন সেই ব্রাউন-পেপারে মোড়া প্যাকেটটিও ফেলে গেলেন।

বারে বারে অশোকদার চোখ সেদিকে যেতে লাগল। কন্ডাক্টরও ছাই এদিকে আসে না। প্যাকেটটা কাছে টেনে নিয়ে, কন্ডাক্টরকে ডেকে অশোকদা—না প্যাকেটটা জমা দিলেন না, ও-ই বা কত সৎ লোক তাই বা কে জানে,—টিকিট কিনলেন। এই সব

boiRboi.blogspot.com

করতে করতে তাঁর বাড়ির স্টপ এসে গেল। উনিও ঘষটাতে ঘষটাতে দরজার কাছে গিয়ে, এক সময় টুপ্ করে নেমে পড়লেন। নামবার সময় ব্রাউন-পেপার প্যাকেটটি নিতে ভুললেন না। কেন নেবেন না? উনি না নিলে তো আর কেউ নিত। তারি বা কি বিশেষ অধিকার? আদি মালিককে সে চোখে দেখেনি পর্যন্ত!

প্যাকেটটা বুকে চেপে অশোকদা এক সময় দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি পৌঁছে নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে, গিন্নির দৃষ্টি বাঁচিয়ে প্যাকেটটা খুলে দেখলেন তার

মধ্যে এক পাউন্ড বড় পাতার সস্তার চা ছাড়া কিছু নেই। তখনকার দাম ছিল বড় জোর আট আনা, অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সা। হ্যাঁ, ভুল শুনছেন না, পঞ্চাশ পয়সাই।

কপালে ঘাম ছুটে গেছিল, হাত থরথর করে কাঁপছিল। ঘাম মোছার জন্যে রুমাল বের করতে পকেটে হাত দিয়েই আঁৎকে উঠলেন। মনিব্যাগটি নেই! নিজের টিকিট কাটার সময় উত্তেজনার চোটে মনিব্যাগ পকেটে না রেখে নিশ্চয় পাশে ফেলে রেখে চলে এসেছেন! এটা হল গিয়ে না-পাওয়ার দুঃখের গল্প।

এর উল্টো গল্পও শুনেছি। তার নায়ক সুধীন্দ্রলাল হলেন খেরোর খাতার খ্যাতনামা হেমেন্দ্রলাল রায়ের জ্যাঠতুতো দাদা। কি করব বলুন? ওঁদের পরিবারের লোকদের যদি নানা রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়, সে তো আর আমার দোষ

নয়। সে যাই হোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ওঁরা তথাকথিত অভিশপ্ত কলকাতা ছেড়ে পশ্চিমগামী এক ট্রেনের থার্ড ক্লাস্ কামরায় উঠে, লখনউ কি আগ্রা কি মথুরা কি বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন।

হাওড়ায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। কিন্তু শেষরাতে ঘুম ভেঙে দেখেন সবাই কখন নেমে গেছে, খালি ওঁদের বাড়ির লোকরা বেহুঁশের মতো ঘুমোচ্ছে আর তাঁর গিন্নির পায়ের কাছে কার একটা আধ হাত লম্বা, পেতল দিয়ে বাঁধানো, সুন্দর হাতবাক্স পড়ে আছে। সুধীন্দ্রলাল হাঁ!

গিন্নির ঘুম ভাঙলে বাড়িসুদ্ধু সবাই বাক্সটা নেড়েচেড়ে দেখলেন যে বেশ ভারি আর ভেতরে কেমন চুন্‌চুন্ শব্দ হয়। ঢাকনি ধরে একটু টানাটানি করতেই কট্ করে সেটা খুলে গেল। বাক্স বোঝাই সোনার আর জড়োয়া গয়না!! তাই দেখে শিউরে উঠে, সুধীন্দ্রলালের গিন্নি দুম্ করে বাক্সটি বন্ধ করে, পরের বড় স্টেশনে স্টেশন-মাস্টারের ঘরে গিয়ে ওটি জমা দিয়ে আসতে সুধীন্দ্রলালকে বাধ্য করলেন। সে লোকটা একটা চিরকুটে রসিদ লিখে দিল বটে, কিন্তু দস্তখৎটা ইংরিজিতে না হিন্দীতে তা পর্যন্ত বোঝা গেল না। ঐখানেই এ গল্পের শেষ। উত্তেজনায় আর নিজেদের মধ্যে খ্যাঁচাখেঁচির কারণে স্টেশনের নামটা পর্যন্ত কেউ দেখল না। আক্ষেপ করে সুধীন্দ্রলাল বলেছিলেন, যে বেচারাদের গয়না, তারা কি আর কখনো ঐ দুষ্পাঠ্য-হস্তাক্ষরওয়ালার কাছ থেকে তাদের জিনিস উদ্ধার করতে পেরেছে? এখন গিন্নি যদি বাক্সটা রাখতে দিতেন, মালিক এসে প্রমাণ দিয়ে চাইলেই সুধীন্দ্রলাল ফেরত দিতেন। পাছে কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়, তাই গিন্নি পরে এ নিয়ে কোনো তদন্ত করতেও দেননি।

তবে সব গল্প এ-রকম হতাশাজনক নয়। মালিকানার অবিশ্যি অনেক জ্বালা তাতে সন্দেহ নেই। একদিন আমার ছোট মাস্তুতো ভাই বলেছিল, 'দাদার কাছে কিছু চেয়ে সুখ নেই।' আমরা বললাম, 'দেয় না বুঝি?' বিমল বলল, 'না, ঠিক তার উল্টো। চাইলেই দিয়ে দেয়। ও রকম ভালো লাগে না। বেশ আমি চাইলে দাদা বলবে, "যা দেখবি অমনি নেওয়া চাই? না, পাবি না। যা, ভাগ্!" আমি বলব, "না দাদা, দাও। দাও বলছি!" শেষটা তিতি-বিরক্ত হয়ে আমার সামনে জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলবে, "নে গে যা! হাড় জ্বালালি রে বাপু!" তবে সে না জিনিস নিয়ে সুখ।'

আমার মাস্তুতো বোন উমা ছিল যেমনি রূপসী, তেমনি শৌখীন, আবার তার চেয়েও বেশি কিপ্টে! নিজে তো পয়সা খরচ করবেই না নিজের মা-কে পর্যন্ত খরচ করতে দেবে না! আত্মীয়স্বজনরা কোনো ভালো জিনিস দিল তো দিল, নইলে নিজে যত রাজ্যের গিল্টি করা আর নকল পাথরের গয়না দিয়ে গা ভরাত। সবগুলো যে দেখতে খারাপ তা বলছি না। কিছুদিন বাদে ওগুলো কালো হয়ে যেত, তখন অনিচ্ছুক কাউকে উপহার দিয়ে, নিজে আবার চকচকে নতুন গিল্টি গয়না কিনত।

boiRboi.net

ওর আলমারি, দেরাজ সর্বদা গয়না দিয়ে ঠাসা থাকত।

এক দিন রাতে ওর ঘরে চোর ঢুকেছিল। চোরের ভয়েই উমা রাতে বুড়ি মাসের ঘরে দরজা-জানলা এঁটে শুত। চোর যে এসেছিল সে-কথা কেউ টের-ও পায়নি।

পরদিন সকালে উমা নিজের ঘরে গিয়ে দেখে অ্যাসবেস্টসের ছাদের এক অংশ তুলে ফেলা হয়েছে, আলমারির দরজা চাড় দিয়ে ভাঙা, ঘরময় গয়না-গাঁটি রংচঙে কাপড় চোপড় ছড়ানো। সুখের বিষয় একটি জিনিসও হারায়নি।

তাই দেখে উমার সে কি রাগ! কি! আমার গায়ের গয়না কি এতই খেলো, এতই খারাপ যে চোরেও নেবে না! কেন? কি এমন মন্দ এগুলো? দেখে তো বোঝাও যায় না যে নকল। দিনে দিনে চোরগুলোর এমন বাড় বেড়েছে দেখে অবাক্ হই!

কুসংস্কার

আমরা যখন ছোট ছিলাম, মেমদের ইস্কুলে পড়তাম, তখন মাঝে মাঝে আমাদের ফিরিঙ্গি দিদিমণিরা দুঃখ করে বলতেন, 'তোমাদের জন্য আমাদের বড়ই কষ্ট হয়। কি রকম সুপারস্টিশাস্ তোমরা। ছি-ছি! ব্রাহ্মিণরা মরে গেলে, তাদের মাথার চুটকি আকাশের দিকে রেখে, লম্বা গর্তে খাড়া দাঁড় করিয়ে পুঁতে রাখ! মাই গড্!' অমনি আমাদের আধা-কালো সহপাঠিনীরা বলতে থাকত, 'হিন্দুজ্ বিশ্বাস করে তাহলে ডে-অফ-জাজমেণ্টে গড্ ওদের টিকি ধরে টেনে সোজা স্বর্গে তুলে নেবেন।'

এ-কথা শুনে আমরা যতই ব্যস্ত হয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি বামুনরা মোটেই মরা লোকদের খাড়া করে পোঁতে না। সবাইকে তারা পুড়িয়ে ফেলে। তাতে ওরা ভীষণ শক্ড্! 'শেম্! শেম্! ঠাট্টা করেও ও-কথা বলতে হয় না। এডুকেটেড লোকরা মরা মানুষদের ভক্তি করে। পুড়িয়ে ফেলে দেয় না!'

আধা-কালো দিদিমণিরা বলতেন, 'অল্ হিন্দুজ্ বেজায় সুপারস্টিশাস! কি করবে বেচারিরা, হেবেনে তো আর যেতে পারবে না, তা সে যত ভালোই হোক না কেন!' এটা আমাদের অবিচার বলে মনে হত। বলতাম, 'কেন? ভালো লোকরাও হেবেনে যাবে না কেন?'

'ওমা, তাও জান না? রোমান ক্যাথলিক ছাড়া কেউ যে হেবেনে যেতে পাবে না।

আর সবাই বড্ড পাপী। তবে যদি পাপ স্বীকার করে আমাদের কিছু প্রেজেন্ট দাও, তাহলে পাপ কমে যাবে।'

বাড়িতে গিয়ে মা-কে প্রেজেন্টের কথা বলতেই, মা খুব হাসতেন। বলতেন, 'ওদের বড্ড কুসংস্কার কিনা'—

'কুসংস্কার আসলে কি মা?'

'কুসংস্কার হল গিয়ে সুপারস্টিশন। যে-সব বিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, তাই মানা আর কি।' ভারি আশ্চর্য লাগত। ওরা তো আমাদের সুপারস্টিশাস্ বলে। মা আবার উল্টো কথা বলছেন! ছেড়ে দিতাম তর্ক।

কিন্তু ছেড়ে দিলেই তো আর হল না। ওরা ছাড়ত না। আমাদের বলত প্রটেস্টান্ট। মা বলতেন, 'মোটেই না, প্রটেস্টান্টরাও খৃশ্চান।' 'কিন্তু ওরা যে বলে প্রটেস্টান্টরা হেবেনে যায় না।' 'ওরা বড্ড গোঁড়া, ক্যাথলিক ছাড়া কাউকে খৃশ্চান বলেই মানে না। তাছাড়া হেবেন বলতে কিছু নেই। যারা ভালো কাজ করে, তাদের ভালো হয়। যারা খারাপ কাজ করে, তাদের খারাপ হয়।'

একবার স্কুলের হল্‌ঘর রং হচ্ছিল। একটা বড় মই দেয়ালে ঠেকিয়ে, তাতে চড়ে মিস্ত্রিরা দেয়ালে ফিকে গোলাপি রং লাগাচ্ছিল।। মেরি নিঢ্যাম তার বন্ধুদের বলল, 'মইয়ের তলা দিয়ে যেও না। ভয়ানক আন্‌লাকি!' পরদিন নিজের চোখেই দেখলাম কত আন্‌লাকি। দুটো দুষ্টু ছেলে কোনো বারণ না শুনে ঐ মইয়ের তলা দিয়েই ছুটে গেল। মইতে ঠ্যাং লটকে গেল, মইটি মিস্ত্রিসুদ্ধু হুড়মুড় করে পড়ল। মিস্ত্রির কনুইতে লাগল আর ছেলে দুটো মাথা থেকে পা অবধি তেলতেলা রং মেখে ভূত!

আরো কত নিয়ম ছিল ওদের। টেবিলে খেতে বসে কেউ নুন ফেললে, আরেক খাবলা নুন নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে না দিলেই সর্বনাশ! তেরোজন এক টেবিলে খেতে বসলে সাংঘাতিক বিপদ হবে। যীশু নাকি ঐ করেই বিপদ ডেকে এনেছিলেন!

একদিন কে জিজ্ঞাসা করল, 'গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে হিন্দুজ্‌রা কি করে? শৈলবালা বলল, 'কি আবার করব? কেশে তুলতে চেষ্টা করি। জল খাই, ভাতের দলা গিলি, আলু গিলি, কাঁদি, তবু যদি না যায় ডাক্তারের কাছে যাই। তিনি একটা সরু লম্বা চিমটে দিয়ে কাঁটা তুলে দেন।'

শুনে ওরা স্তম্ভিত। 'মাই গড্!' ও-সব কিছুই করবার দরকার নেই। সত্যি তোমরা বড্ড গোঁড়া। স্রেফ্ একটা বোলে একটু জল নিয়ে, তার ওপর ছুরি দিয়ে একটা ক্রুশ্ চিহ্ন আঁকলেই বাপ বাপ বলে কাঁটা নেমে যায়! এ-ও জান না? রিয়েলি!'

শুধু ওরা কেন, অন্যরাও নানা রকম অদ্ভুত কথা বলতেন। পাশের বাড়ির দিদিমা একদিন তাঁর নাতিদের ডেকে খুব বকাবকি করতে লাগলেন, 'তোদের কি কোনো আক্কেল নেই? ঠ্যাং ফাঁক করে, মাথা ঝুলিয়ে, ঠ্যাং-এর ফাঁক দিয়ে পেছন

boiRboi.net

দিকে ফের তাকাচ্ছিস্ ! তাই তো তোদের কাকিমার একটার পর একটা খালি মেয়েই হয় !'

দিদিমা আরো বলতেন, ছাগলের দড়ি ডিঙোলে নাকি খারাপ কিছু হয়। তা অবিশ্যি হতেই পারে, যদি ঠিক সেই সময় ছাগলটা উঠে পড়ে তেড়ে আসে, কিম্বা দৌড় মারে। তিন বামুন একসঙ্গে গেলে নাকি রেলের কলিশন হয়। বিষ্যুৎবারের বারবেলায়—অর্থাৎ বেলা বারোটার পর—যাত্রা করলে কি হয়, সে অভিজ্ঞতা তো আমাদের হাতেনাতে হয়েছিল। শুনুন বলি।

শান্তিনিকেতন থেকে পৌষ উৎসবের পর কলকাতায় ফিরছি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রওনা হয়ে শক্তিগড় ছাড়িয়ে নিরাপদে আরো মাইল বারো গিয়ে, রসুল-

পুরের লেবেল-ক্রসিং-এর কাছে সেই যে গাড়ি বিগড়ে গেল, সে আর চলল না। বাকি দিনটা চেষ্টা চরিত্তির করবার পর যখন বোঝা গেল যে মোক্ষম একটা অংশ ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেছে, কারখানা ছাড়া উপায় নেই। তখন রাত প্রায় দশটা।

বর্ধমানগামী শেষ বাস্‌টার সঙ্গে জাহাজের কাছির মতো মোটা দড়ি দিয়ে গাড়ি বেঁধে, আবার বর্ধমান ফিরে চললাম। সেখানকার কারখানায় সারা রাত গাড়ি সারানোর কাজ হয়।

boiRboi.net

আমরা বাসে উঠে বসতেই, সামনের সীট থেকে একজন বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু মনে কর না, মা, কটার সময় রওনা হয়েছিলে?'

বললাম, 'এই পৌনে একটা হবে।'

মহাখুশি হয়ে তিনি তাঁর পাশে বসা খিট্‌খিটে চেহারার লোকটিকে বললেন, 'এবার বিশ্বাস হল তো? আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন, এ-সব বিশ্বাস করেন না। বিষ্যুৎবারের বারবেলায় বেরিয়ে এনাদের অমন ভালো গাড়িটার দফা-রফা! আর আপনার মামলার ঐসব জরুরী কাগজ-পত্র বেমালুম চুরি হয়ে গেল! এক ঘণ্টা আগে বেরোতে কি হয়েছিল? এ-সব কিছুই ঘটত না।'

আরেকটা গল্প এক বোর্ডিং-স্কুলের দিদিমণি বলেছিলেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, অথচ কিছু কিছু কুসংস্কার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। ওঁদের বোর্ডিং-এ খাবার টেবিলে এক ছড়া মর্তমান কলা দিয়েছে। তার মধ্যে একটা জোড়া-কলা, তা সেটি কেউ খাচ্ছে না। দিদিমণি ভাবলেন, এই তো কুসংস্কার সম্বন্ধে ছোটখাটো একটা ভাষণ দেবার সুযোগ পাওয়া গেল।

এই ভেবে তিনি শুরু করলেন, 'জোড়া-কলা খাবে না কেন? কি হয় খেলে?' বড় মেয়েগুলো এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। এরি মধ্যে ছোট্ট একটা সাত বছরের মেয়ে বলে উঠল, 'কিচ্ছু হয় না দেখুন। ওরা বলে নাকি জোড়া-কলা খেলে জোড়া-খোকা হয়। কিন্তু আমি অনেকবার খেয়ে দেখেছি, কিচ্ছু হয় না। জোড়া কেন, একটাও হয় না!'

মেয়েদের কথা

খেরোর খাতার শেষ কথা মেয়েদের নিয়ে বললেই সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ ঘরে ঘরে সব তর্কে মেয়েদেরি শেষ কথা থাকে। তবে মেয়ে বলতে আমি এখনকার মেয়েদের কথাও বলছি না, আমার যৌবনকালের মেয়েদের কথাও বলছি না। এখনকার মেয়েদের আমি সব সময় মেয়ে বলে চিনতে পারি না। কি চেহারায়, কি সাজে, কি কর্মদক্ষতায়, কোনো দিক দিয়েই তারা ছেলেদের চেয়ে আলাদা নয়।

আমি ভাবছিলাম একশো বছর আগেকার মেয়েদের কথা। কি তেজ ছিল তাঁদের! গায়েও কি জোর! আজকালকার মেয়েরা তো পুরুষদের সমান হয়ে গেছে, সমান

চাকরি করে, সমান মাইনে পায়, সমান ভোট দেয়, সমান আন্দোলন করে। তা হয়তো করে, কিন্তু সে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। দাঁড়াক তো এরা সেকালের গিন্নিদের পায়ের কাছে!

কি রাঁধতেন তাঁরা—হ্যাঁ, আমি একশোবার বলব ঘরকন্নাও হল মেয়েদের এলাকা, তার বাইরে যে অধিকারই থাকুক না কেন—রেঁধে গাঁসুদ্ধু সব্বাইকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিতেন। দেখতে হয়তো সবাই এখনকার মেয়েদের মতো সুন্দরী ছিলেন না। মুখেও কিছু মাখতেন না ; নুড়ো করে নখ কাটতেন, মাথায় উব্‌কো খোঁপা বাঁধতেন—বিশ্বাস করুন, এসবে সুন্দর না দেখাতে পারে, কিন্তু যেমনি আরাম, তেমনি কাজে সুবিধে। প্রায় চল্লিশ বছর করে দেখেছি। গিন্নিরা বাড়িতে শাদা কাপড় পরতেন, বেরুলে হয়তো গরদ, তসর। ভারি ভারি সোনার গয়না থাকলে পরতেন, না থাকলে শাঁখা আর লোহা। নকল জিনিস গায়ে তুলতেন না। সে যাক্‌ গে, আসলে রূপের কথা বলছিলাম না, বলছিলাম তেজের কথা।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ঠাকুমা কি ঐ রকম কিছু হতেন লক্ষ্মীদেবী। মজিলপুরে ওঁদের বাড়ি ছিল। কলকাতার মাইল ত্রিশেক পূব-দক্ষিণে ; সুন্দরবনের গা ঘেঁষে। সে সুন্দরবন এখনকার সুন্দরবন নয়। এখন তো শুনি বাঘের চাষ করতে হয়। সেকালে ওখানে বাঘ কিলবিল করত। অবিশ্যি নিশ্চয়ই খুব ভালো মাছ পাওয়া যেত, নইলে লোকে থাকবে কেন? তবে ওঁদের বেশির ভাগই বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, নিরামিষ খেতেন।

কিন্তু বাঘরা তো আর নিরামিষ খেত না। শীতকালে হরদম এসে তারা গাঁয়ে ঢুকে হামলা করত। তাদের ভয়ে ওরা একটা বুদ্ধি করেছিল। ছয়-সাত ঘর আত্মীয়-কুটুম্ব কাছাকাছি বাড়ি তৈরি করে, চারদিক ঘিরে দু-মানুষ উঁচু পাঁচিল দিত। বাঘ সে পাঁচিল টপকাতে পারত না।

সামনের দিকে পাঁচিলের গায়ে একটিমাত্র সদর দরজা। সেটি বন্ধ করে দিলেই অনেকটা বাঁচোয়া। মুশ্‌কিল হল, যার যার আলাদা খিড়কি-দোর। প্রাণের ভয়ে যে যার খিড়কি আগলাত। তবে মাঝেমধ্যে ভুল-ও হত।

শীতকালে এক দিন সবে সন্ধ্যা নেমেছে। শিবনাথের ঠাকুরদার বাবা সন্ধ্যা আহ্নিক করছেন। তাঁর ছেলে আহ্নিক সেরে, খড়ম পায়ে দিয়ে উঠোনে পাইচারি করছেন। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী রান্না চড়িয়েছেন।

এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে চিৎকার! 'বাঘ! বাঘ! বাঘ এসেছে!' কি ব্যাপার দেখবার জন্য ঠাকুরদা যেই না সেদিকে এগিয়ে গেছেন, অমনি বাঘের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি! ঠাকুরদা তো কাঠ! তারি মধ্যে একবার কোনোমতে চেঁচিয়ে বললেন, 'বাবা! সত্যি বাঘ! আমাকে নিল বলে!'

বুড়ো বাবা বলেন, 'দাঁড়িয়ে থাক্‌! নড়িস্‌ নে! বাঘের দিকে পেছন ফিরিস্‌ নে! তাহলেই বাঘে নেয়!' হাঁকডাক শুনে যে যেখানে ছিল দৌড়ে এল। কিন্তু এ

অবস্থায় কি করা উচিত স্থির করবার আগেই, উনুন থেকে মস্ত এক জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে, 'তবে রে!' বলে লক্ষ্মীঠাকুরুণ ছুটে এলেন!

সেই গনগনে আগুন আর সম্ভবতঃ লক্ষ্মীঠাকরুনের ঐ উগ্র বে-পরোয়া চেহারা দেখে, বাঘমশাই ল্যাজ তুলে খোলা খিড়কি-দোর দিয়ে সেই যে পালাল আর এ-মুখো হল না। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে খিড়কি বন্ধ হল। রাগারাগি, বকাবকি।

আমার ঠাকুরদার ঠারাইন-পিসির জাঁদরেল দশা-সই চেহারা ছিল। লম্বায় চওড়ায় প্রায় সমান। কুচকুচে কালো রং। চুলগুলো পুরুষদের মতো ছাঁটা। পরনে থান। একদিন বিকেলে বড়-বাগানে নারকোল পাড়াচ্ছেন। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে নাতনি এসে বলল, 'তেঁতুলতলায় তোমার শাদা বাছুরকে বাঘে ধরেছে!'

আর যায় কোথা! নারকোল রইল পড়ে, হাতে এক জোড়া ডাব ছিল, তাই নিয়ে পিসি ছুটলেন তেঁতুলতলায়। সেই সুযোগে বাকিরা 'বাঘ! বাঘ!' বলে হাঁক পাড়তে পাড়তে, মাঠের দিকে ছুটল!

চ্যাঁচামেচি শুনে, মাঠে যারা কাজ করছিল তারা কাস্তে কুড়ুল, লাঠি, খেঁচা, যে যা পেল নিয়ে দৌড়ে এল। তেঁতুলতলায় পৌঁছে দেখে দু-চক্ষু লাল করে পিসি ডবল-ডাব দিয়ে বাঘের মাথায় পিটিয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে তাঁকে টেনে আনতে হল।

সেকালের গিন্নিরা এই রকম ছিলেন। গল্প শুনেছি ঢাকার ওদিকে বাড়িতে

pathagar.net

ডাকাত পড়লে মা-কালী সেজে বিকট গর্জন করে কাদের বাড়ির গিন্নি ডাকাত ভাগিয়েছিলেন।

জানেন, আমি আমার বাবার ৮৪ বছরের মামীকে দেখেছি পদ্মফুলের মতো সুন্দর, বসে বসে হুঁকো খাচ্ছেন! তবে আবার আধুনিক কাকে বলব? এই বলে খেরোর খাতা বন্ধ করলাম।

boiRboi.net